



অকুঁৱ মণ্ডল

BFC PUBLICATIONS



# BFC PUBLICATIONS



Published by:

BFC Publications Private Limited  
CP-61, Viraj Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow-226010

ISBN:

Copyright (©) **Ankur Mondal** (2021)

All rights reserved.

No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording without specific prior permission of the publisher. Any person who does any unauthorised act in relation to the publication of this work may be liable to legal proceedings and civil claims for damages.

The views expressed and the materials provided in this book are solely those of the author and presented by the publisher in good faith. All the names, places, events and incidents are either the product of the author's imagination or are used fictitiously. Any resemblance is purely coincidental. The author and the publisher will not be responsible for any action taken by a reader based on the content of this book. This work does not aim to hurt sentiments of any religion, class, section, region, nationality or gender.

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রী ঠাকুরের অকুপণ আশীর্বাদে, জীবনের প্রথম লগ্নে, যাঁদের কাছে প্রথম কথা বলতে শিখি, তাঁরা আর কেউ নয় আমার মা বাবা। তাই প্রহমেই আমার আন্তরিক প্রণাম জানায় শ্রী ঠাকুরের পদতলে। যখন আমি ইস্কুল জীবনে পা রাখি, আমার ভাই তখন আমাদের ঘরে আলো করে আসে। কিশোর বয়েস থেকেই তার লেখনীর ক্ষমতা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যায়। খুব ছোটতে আমার মা আমাকে পড়াতেন, কিন্তু পঞ্চম শ্রেণী থেকে বাবাই হয়ে উঠলেন আমার পড়াশুনো তথা জীবন গঠনের আসল কারিগর। বাবার মুখে অনর্গল বাংলা উদ্ধৃতি শুনে শুনেই আমার বাংলা জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। মাধ্যমিক স্তর থেকে, ক্রমে বাংলা ভাষার প্রতি আমার ভালবাসা গড়ে ওঠে। তারপর কলেজ জীবনের শুরু। সেই প্রথম কলম ধরি, সম্ভরণে। যদিও সেগুলি ছিল নিতান্ত ছোট গল্প। তাই সেগুলি প্রকাশ করব, কখনও মনে আসেনি।

তারপর দীর্ঘ কর্মজীবন পেড়িয়ে হঠাৎ অতিমারির কারণে, সব কিছু যখন এলোমেলো হয়ে গেল, ঠিক তখনি আমাদের আবাসনে “আরবান সবুজায়ান সাহিত্য সমিতি” -এর উদ্যোগে আবার কলম ধরি। প্রথমে কবিতা দিয়েই শুরু করি। তারপর বিভিন্ন পাঠকের অনুরোধে এই প্রথম গদ্য রচনা। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, এই রচনা পুরোটাই কাল্পনিক, যার মূল বিষয় আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃতি প্রেম। স্বয়ং শ্রী ঠাকুর মা স্বামীজি ও গুরু মহারাজের আশীর্বাদ, বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখকদের বইয়ের সারাংশ আমার কলমকে অবিচ্ছেদ্য গতিধারা ও প্রাণ সঞ্চার করেছে। আমার শত কোটি প্রণাম ওঁনাদের কাছে। এর পর, যার কথা না বললেই নয়, যে আমার পাণ্ডুলিপি, সংসারের সমস্ত কাজের পরেও, কম্পিউটারে টাইপ করে আমার লেখনীকে বাস্তবায়িত করেছে, সে হল আমার সহধর্মিণী। তাই তাঁর কাছেও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শেষ করার আগে আরেকবার, শ্রী ঠাকুর শ্রী মা শ্রী স্বামীজি শ্রী গুরুদেব, আমার বাবা, আমার স্ত্রী, বাংলার সাহিত্যকূল, আমাদের সাহিত্য সমিতি ও পাঠকগণকে জানাই আমার আন্তরিক প্রণাম।

**-অক্ষুর মণ্ডল**



## সূচীপত্র

১। সূত্রপাত	7
২। মহাদেবের বাঘ শিকার	25
৩। বনদেবতার আশীর্বাদ ও মহাদেবের নবজীবন	31
৪। মহাদেব প্রধানের প্রধান অতিথি	37
৫। প্রধানের আসল পরিচয়	43
৬। ভূমিকম্প ও বর্তমান প্রধানের অভ্যুত্থান	53
৭। ডাক্তারের আন্তরিক সেবা	59
৮। মহাদেবের বন্য অভ্যুত্থান	65
৯। আদিবাসী বিবাহ	70
১০। ঝর্নার ওপার দর্শন	75
১১। মহাদেব বনের রাজা	78



## ১। সূত্রপাত

রাঢ় অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত এলাকা, এক পাহাড়ি গ্রাম। চার দিকে ঘন জঙ্গল, মাঝে মাঝে কিছু বাড়ি ঘর ইতিউতি উঁকি মারে। আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তো দূরের কথা, এখানে সেখানে লন্ঠনের ব্যবহার প্রচলিত। রাত্রিবেলা এখানে দরকারে মশাল জ্বলে। কিছু নাম মাত্র শিক্ষিত মানুষ ছাড়া এখানে সেরকম কেউ থাকে না। খুরি, একটু ভুল হলো।

এখানে এখনো বন্য প্রাণীরা স্বমহিমাই জাগ্রত। এদের সাথেই বসবাস করে কিছু মানুষ যারা সেই আদিম যুগ থেকে এখানে নিজেদের অস্তিত্ব বহন করে চলেছে।

অবাক হচ্ছেন তো! না, এ এক রুঢ় বাস্তব।

ডারউইন তত্ত্ব এরা বোঝেনা, পড়াশোনার আলোকপাত এখানে এখানে সেভাবে হয়নি। কিন্তু ডারউইন তত্ত্বের “যোগ্যতমের উদবর্তন” – মতবাদ, এরা সকলেই বংশ পরম্পরায় সফল ভাবে বয়ে চলেছে। সাথে বহন করে চলেছে আপন বংশ গরিমা।

হ্যাঁ, এ শুধু ভারতবর্ষের কোনও বিচ্ছিন্ন এলাকা নয়। গোটা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে এরকম অজস্র গ্রামাঞ্চল।

হ্যাঁ, আমি এদের কথাই বলতে এসেছি। যারা আধুনিক সমাজকে আজও মানতে নারাজ। গুগল এ খোঁজ করলে বা ইতিহাসের পাতায়- এদের অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু জেনে রাখা ভালো, কোনো তথ্যই এক নয়। এক এক জায়গাই এক এক রকমের তথ্য। আসলে আমরা আধুনিক সমাজের অত্যাধুনিক নাগরিক কোনোদিন এদের খোঁজ নিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়।

এই প্রসঙ্গে, একটা বিশেষ কথা বলে রাখা ভালো। আমরা আজ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির রোবট মাত্র -

কিন্তু এরা আজও মানুষ, নিখাদ মানব জাতি। আর আমরা, এদেরকেই চিনি অশিক্ষিত, যাযাবর, নিম্নশ্রেণীর মানুষ হিসেবে। এরাই সেই জন যারা অনার্য নামে পরিচিত-

আল্ল মর্যাদায় এদের জুড়ি মেলা ভার,  
বংশ মর্যাদায় এরা আজও উপরে সবার,  
শরীর চর্চা, বড় হাস্যকর তাঁদের কাছে,  
গোটা শরীর, লৌহসম পেশিবহুল সবার।  
রংটা তাঁরা পাইনি দেবতার কল্যাণে,  
পাছে নাকটা বেঁকে যাই ছুত মার্গের টানে।

এমনই এক গ্রামে চাকরি সূত্রে পোস্টিং পেয়েছেন আমার গল্পের মুখ্য চরিত্র মহাদেব দত্ত। ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার হিসেবে ভালো নামডাক তার। এই গ্রামে সাধারণত ভয়ে কেউ পোস্টিং নেয় না। কিন্তু মহাদেব চিরকাল ডাকাবুকো। ছোট বেলার থেকেই খেলাধুলো, শরীর চর্চা, কুস্তি, সাঁতার সবকিছুতেই নজরকাড়া। কিশোর বয়স থেকেই সাঁতরে নদী পেরোনো, অনায়াসে গাছে চড়া, কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে নিমেষে হারানো- যেন তার অভ্যাস ছিল। বন্যায়, ঝড়- ঝঞ্ঝায়, সব রকম প্রতিকূলতা থেকে মানুষকে বাঁচানোর অদম্য ক্ষমতা সেই কিশোর বয়স থেকেই সে করায়ত্ত করেছে। তারপর যৌবনের প্রারম্ভে পাহাড়ে চড়া, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শৃঙ্গগুলি সে জয় করেছে। বাড়িতে প্রচুর পুরস্কার ও স্মারকলিপি।

এ হেন মহাদেব, আজ দুই দিন হলো এখানে সরকারি কটেজে উঠেছে। সাথে সঙ্গী বলতে দুজন পাহারাদার আর একটি রান্না করার ছেলে যে রান্না করে। সকলেই এই গ্রামেরই।

প্রথম দিনেই, মহাদেব তার দুই অনুচরকে নিয়ে গ্রামটা ঘুরে ঘুরে সারাদিন দেখল। দেখে শুলে মহাদেব খুব তাড়াতাড়ি গ্রাম ও গ্রামের মানুষ গুলিকে ভালোবেসে ফেলে। ঠিক যেন প্রথম দর্শনেই প্রেম। বলা ভালো মহাদেব বিয়ে করেনি। যাবতীয় প্রেম তার এই প্রকৃতিকে নিয়েই। প্রথম দিন ঘুরতে গিয়ে তার দুই সঙ্গী মহাদেবকে কিছু সতর্ক বাণী বলেছিল। যেমন - রাতে বেরোবেন না, কোন কোন রাস্তায় একা যাবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাহাড়ি এই গ্রামে সুন্দর একটা জলপ্রপাত আছে। গেলে পরে ঠিক যেন এক সুন্দরী রমণীর মোহময়ী হাতছানি দেখা যায়। মুগ্ধ হয়ে দেখেছিল মহাদেব। এখানেও আছে বিধি নিষেধ।



ভোর বেলা, দুপুর বেলা এখানে যে কোনও পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নিয়মের ব্যাতিক্রম করলে তাঁকে জঙ্গলে বেঁধে নিয়ে গিয়ে হিংস্র স্বাপেদের সামনে ছেড়ে দেওয়া হয়। কারণ ওই দুই সময় গ্রামের যত মহিলা আছে তারা স্নানে বা অন্য কাজে যান।

এটা, খাতায়- কলমে কোনও নিয়ম নয়, এ হলো গ্রামের প্রধানের নির্দেশ যা কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না।

ঠিক একই ভাবে জঙ্গলের মধ্যে বিশাল এক জলাধার আছে। সেখানে কোনও মহিলার প্রবেশ নিষিদ্ধ- সে দিকটা শুধু পুরুষদের জন্য নির্ধারিত।

সেদিন সারাদিন, ঘোরাঘুরির পর রাতে শোবার সময় মহাদেব তার ভালোলাগা ভালোবাসার জগতে ডুবে গেল। চোখ বুজে শুয়ে, মহাদেব একের পর এক, সুন্দর প্রকৃতির রূপ জগতে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

অনেক রাতে, অদ্ভুত এক দর্শন। এক বেঁটে খাটো বৃদ্ধ লোক মহাদেবের ঘরের ভিতর একটা ছোট্ট মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধের পরনে একফালি কটিবস্ত্র, আর সারা গায়ে অদ্ভুত সব আল্পনা আঁকা, মাথায় পাখির পালকের মুকুট, দুই কানে বড় বড় দুল, দুই হাতে আর গায়ে তালপাতার অদ্ভুত বস্ত্র, আর চোখ দুটো- যেন জ্বল জ্বল করছে। মশালের আলোতে আরো যেন ভয়ংকর লাগে।

যেন কোনও ভয় নেই, এমন ভাব দেখিয়ে মহাদেব উঠে বসল, জিজ্ঞাস করল, “কে আপনি? এতো রাতে কি দরকার? আপনি নিঃসংকোচে বলুন। গ্রামে কি বিপদ হয়েছে?”

বৃদ্ধ কোনও উত্তর দেয় না। শুধু ঈশারা করে তার সাথে আসতে। মহাদেব এবার যেন কিছুটা স্তম্ভিত, অপ্রস্তুত। তবুও অতীতের অভিজ্ঞতায় ভর দিয়ে জামা, প্যান্ট পরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু, বড় অদ্ভুত জিনিস- দারোয়ানরা আর রান্না করার ছেলেটাই বা কই? ঘর খোলা, ঘরে কেউ নেই! রক্ত-মাংসের মানুষ, মহাদেবের শরীর দিয়ে যেন হিমশীতল রক্ত নেমে গেল। আর যায় কোথায়, মহাদেব এবার সচেতন। বৃদ্ধ দরজার বাইরে যেতেই মহাদেব ঝটপট দরজার কোণে ঝোলানো লম্বা ছোরাটা কোমরে গুঁজে নেয়। আত্মরক্ষার জন্য, হাতের কাছে, সে আর কিছু পেলনা।

তারপর দরজা লাগিয়ে মহাদেব বৃদ্ধের পিছু পিছু চলতে থাকে। মনে নানা প্রশ্ন- কে এই বুড়োটা- কেনই বা এত রাতে- ঘর ফাঁকাই বা কেন? কোনও উত্তর নেই। যেন, এখন সে কোনও অফিসার নয়, শুধু এই বুড়োটার চাকর।

চার দিকে নিকস কালো অন্ধকার আর ঘন জঙ্গল। শুধু মশালের আলোটা ভরসা। হঠাৎ করে মহাদেবের মনে পরে যায়, তারাহুড়োতে সে টর্চটাও সাথে নিতে ভুলেছে। হে ঈশ্বর! একি ছলনা- এতো বড় ভুল কেউ করে!

চোয়াল শক্ত করে মহাদেব, নিজের শরীরকে পাথরের মতো করে নেয়। কখন কী ঘটে, কেউ জানে না। এদিকে, বুড়োটা এতো তাড়াতাড়ি হাঁটছে যেন অলিম্পিকে হন্টন প্রতিযোগিতা দিচ্ছে। তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে মহাদেব, একের পর এক হোঁচট খায়- আবার বুড়োটার পিছনে দৌড়ে গিয়ে সাথ দেয়।

প্রায় আধ ঘন্টা অন্ধ অনুচরের মতো মহাদেব শুধু বুড়োটার পিছনে প্রায় ছুটে চলছে। হঠাৎ যেন মহাদেব চমকে ওঠে, চিৎকার করে বলে, “এই যে- এই যে- দাঁড়ান- দাঁড়ান।” কে কার কথা শোনে। বুড়ো আরও জোরে হাঁটতে থাকে। এই রাস্তাটা মহাদেবের চেনা, এতো সেই জলপ্রপাত যাবার রাস্তা। কিছু করার নেই, মহাদেব এবার দৌড়ে গিয়ে বুড়োটাকে ধরতে গেলো এবং একটা বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে মুখ খুবড়ে উল্টে পড়ল। কোনও রকমে, মহাদেব ওই অবস্থায় উঠে দাঁড়াল। দেখল বুড়োটা পালায়নি। বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে খিল খিল করে হাসছে। মহাদেব এবার চরম রেগে গিয়ে-

“কি চাইছেন কি আপনি, মুখে কোনও কথা নেই শুধু হনহনিয়ে হাঁটছেন? আর আমি পরে গেছি, বলে আপনার হাসি পাচ্ছে? কে আপনি? বলুন কি দরকার?”

বুড়ো আবার চুপ। মহাদেবও চুপ- শুধু হাসছে। কোনও উত্তর না পেয়ে, আবার প্রশ্ন করে, “কি হলটা কি? কিছু তো বলবেন?” বুড়ো এবার জলপ্রপাতের দিকে ঈশারা করে। “না কখনওই নয়- আর এক পাও নয়- আগে বলুন কি দরকার-”, তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে মহাদেব। বুড়ো এবার ডান হাত দিয়ে জ্বলন্ত মশালটা নিবিয়ে দিল।

একি! ? একি সর্বনাশ- বুড়োটা কি পাগল- নাকি অন্য কেউ? মহাদেব মনে মনে প্রশ্ন করে, হাত দিয়েই জ্বলন্ত আগুন ধরে নিভিয়ে দিলো! হাতটা তো

পুড়ে যেতো! এতক্ষণ পুরো রাস্তায় অনেক বন্যপ্রাণী, রাতপাখির আওয়াজ শুনেছিল মহাদেব। ছোট- খাটো শেয়াল- কুকুর, এদিক- ওদিকে, দেখেছিল। যদিও এতো রাত্রে তারা শিকারে বেরোয়। কিন্তু অদ্বুতভাবে কোনও বন্যপ্রাণী মহাদেব বা বুড়োটার উপর ঝাঁপিয়ে পরেনি। এও এক বড় অদ্বুত অভিজ্ঞতা।

কিন্তু, এখন আর চারদিকে কোনও আওয়াজ নেই, শুধু ঠান্ডা হওয়া চারদিকে। বুড়ো, আবার হাঁটা শুরু করল, তবে ধীর পায়ে, ঠিক জলপ্রপাতের সামনে গিয়ে স্থির হলো। হাতে নেই টর্চ, মশালও জ্বলছে না। তবু ধীরে ধীরে প্রকৃতির নিয়মে আস্তে আস্তে ঘন অন্ধকার যেন কছুটা ফিকে হয়ে আসছে। কৃষ্ণ পক্ষের রাত, আকাশে চাঁদ নেই, শুধু মহাকালের অকৃত্রিম অন্তত তারাজগৎ চিরন্তন হাতছানি দেয়। তাদের সেই সুদূর জগৎ থেকে কি করে যেন, এই ঘন কালো অন্ধকারে কিছু ফোটন কনা পার্ঠিয়ে দিচ্ছে। আর সেই কল্পনাতেই মহাদেব চারদিকটা আবছা হলেও অনুধাবন করতে পারছে।

ধীরে ধীরে, মনে আবার সাহস ফিরে পায় মহাদেব। ধীর মন্তর পায়ে সে বুড়োটার দিকে এগোতে লাগল। ঠিক বুড়োটার কাছে যেতেই- বুড়োটা প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু থেকে জলপ্রপাতের উপর ঝাঁপ দিলো। ভয় পেয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে মহাদেব-

“এ-এ-এই-ই-, কি করছেন কি? এ-এ-এই-ই-”,

চারদিকে, রাতের আঁধারে, মহাদেবের আওয়াজ, এখান ওখান থেকে ধাক্কা খেতে খেতে মিলিয়ে গেল।

কিন্তু এবার! কি করবে সে! দ্রুত পিছন ফেরে সে- বাড়ি যাবে সে। আর কোনও উপায় নেই। কিন্তু একি! রাস্তার সামনে এই বিশাল বটগাছটা কোথেকে এলো! রাস্তাই বা কই? সব যেন কি রকম গুলিয়ে যাচ্ছে মহাদেবের। হঠাৎ করে, একটা ঝোড়ো দিতে শুরু করে চারদিকে। এক অদ্বুত শব্দ, কে যেন ডাকে- “আ-আয়- আ-আয়।” যে দিকে তাকাই মহাদেব দেখে শীতল হওয়ার সাথে সাদাসাদা ফুলের মতো কি যেন উড়ছে। জলপ্রপাতের দিকে তাকাতেই আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। প্রায় শযে শযে কিছু সাদা কাপড় উড়ে বেড়াচ্ছে। গোটা এলাকাটা এক ভুতুড়ে পরিবেশে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি মহাদেব বটগাছটাই চড়তে গেলো। হঠাৎ করে, পিছন থেকে সেই উড়ন্ত, এক সাদা কাপড়, মহাদেবের শরীরে জড়িয়ে গেলো। ভয়ে

আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে মহাদেব। “বাঁ-চা-ও- কে- আছ- বাঁ-চা-ও- আমাকে।” বলেই কাপড়টা দূরে ছুরে ফেলে আর সেই গাছের নিচে চোখ বন্ধ করে বটের শিকরের ফাঁকে লুকিয়ে পরে সে।

গোটা শরীর খড় খড় করে কাঁপছে তার। হাত-পা, এবার অবশ হয়ে আসছে। প্রায় কতক্ষণ এরকম চলেছিল, বলাই বাহুল্য, মহাদেব কেন, কারোর মাথায় থাকার কথা নয়। তবে বেশ কিছুক্ষণ পরে ঝোড়ো হাওয়াটা থামে। আর কোনও আওয়াজ নেই, ক্লান্ত শরীরে মহাদেব ধীরে ধীরে চোখ মেলার চেষ্টা করে। কিছুতেই সে পারেনা চোখ মেলতে। শরীরে কোনও ক্ষমতা নেই। তখনই মহাদেবের মনে পরে স্বামীজির সেই মন্ত্র – “এ জগতে সবচেয়ে বড় পাপ হলো নিজেকে দুর্বল ভাবা।”

মহাদেব ধীরে ধীরে চোখ মেলল, অলস ভাবে দুপাশে পরে থাকা হাত দুটি তুলে বুকে ঠেকাল। ছোট থেকেই সে, স্বামীজির আদর্শে দীক্ষিত। যেকোনো বিপদে তিনিই মহাদেবের প্রাণশক্তি। আর নয়, এবার বাড়ি ফিরতেই হবে। বটগাছের শিকরের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসে দেখে দূর আকাশে আধখানা চাঁদ উঠেছে। চারদিকটায় এখন অনেকটা আলো।

চারদিকটা অনেক স্বাভাবিক। চাঁদের আলোয়, ঝরনাটা, সত্যিই আরও রহস্যময়ী- রূপসী- তন্য- হয়ে উঠেছে। না তবে আর নয়, আর মায়া নয়। বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু পথ কই?

চারদিকটা তাকিয়ে দেখে মহাদেব। হঠাৎ করে, পিছন থেকে কে যেন মহাদেবের ঘাড়ে হাত দেয়, চমকে ওঠে মহাদেব, আর পিছনে দেখে এক বিশাল দেহি মনুষ্য, অন্ধকারে ভালো করে চেনা যায় না। প্রায় অর্ধ উলঙ্গ, বুড়োটার মতো সেই পাতা জড়ানো কটি বস্ত্র। আবার যেন মহাদেব মনে বল পায়, শেষে একজন মানুষের দেখা তো মিলল। আবার জিজ্ঞাস করে মহাদেব, “কে আপনি, এখানে কেন?”

এই লোকটিও নিরুত্তর, মহাদেব অবাক! তবে ভয় নেই হাতে পায়ে বল ফিরে পেয়েছে, আর ছোড়াটাও সাথে আছে। সেই লোকটি আবার চলতে শুরু করে। মহাদেব পিছনে- যেন অজানা অচেনা এক পৃথিবীতে সে বিচরন করছে। হঠাৎ সে বুঝতে পারে এতো চেনা রাস্তা। যে রাস্তায় সে এখানে এসেছিল। তাহলে বটগাছটা? পিছনে ফিরে দেখে কিছু নেই! শুধু জলপ্রপাত! এ কিসের মায়াজাল? তবে এবার

রাস্তা চেনা, কোনও চিন্তা নেই। লম্বা মানুষটা একটু এগিয়ে গেলো। মহাদেব এই সময় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পরে। একটু পর, লম্বা মানুষটা এদিক ওদিক দেখে সামনের জঙ্গলে ঢুকে যায়। মহাদেব যেন প্রাণ ফিরে পেলো। এবার সে দৌড় শুরু করল। সোজা বাড়ির দিকে, আকাশে চাঁদের আলো, আহা কী আনন্দ। হঠাৎ করে মহাদেবের জল তেষ্ঠা পাই, আর পারে না-

তবু সে ছোট্ট প্রাণের টানে,  
চারদিকে যে বিপদ হানে,  
যা হয় আজ হবে যা ঝুপে।  
এক মুহূর্ত আর সময় না বনে।

-পা চলতে চলতে, কোথায় যেন এক সুর ভেসে আসে, আবার! মহাদেব আর শুনতে নারাজ, কোথাও যেতেও নারাজ। সে চলতেই থাকে পাহাড়ি জঙ্গলের পথে, কিন্তু মহাদেব আবার পথ হারাল। এবার যে সামনে দেখে বিশাল এক লোকগোষ্ঠী। তাঁরা মৃদঙ্গের তালে তাল মিলিয়ে নাচ গান করছে। মশালের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। ওইখানেই এক ঝোপের আড়ালে মহাদেব বসে পরে। শুধু খোঁজে একটু জল। চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু কোথায় জল? নাচ গানের আসরটির ঠিক সামনেই এক বিশাল উঁচু পাহাড়ের মতো শৃঙ্গ, মাটির উপরে যেন ওটা বসানো। মহাদেব আর পারছে না, চিৎকার করে বলে, “আমায়- একটু- জল- দাও- জল।”

চিৎকার করেই যাই, “জল -দাও- জল দাও-”

পিছন থেকে কে যেন মাথায় জল ঢেলে দেয়, ও মুখেও জল দেয়। আকর্ষিত জল খেয়ে মহাদেব চোখ খোলে। চোখে ঘোর মহাদেবের। বলে, “একি তোমরা?” মহাদেব চোখ মেলে দেখে দুই দারোয়ান আর রান্না করার ছেলেটি মাথার কাছে।

ভয় ভয় চোখে তাঁরা মহাদেবের দিকে তাকিয়ে। রান্না করার ছেলেটি প্রায় কেঁদেই ফেললো। “স্যার -র -র, আপনি ভালো হয়ে গেছেন, কত আনন্দ হচ্ছে কি কইবো।”

মহাদেব মাথা তুলে বসতে গিয়ে আবার মাথা ঘুরে যায়। জিজ্ঞাসা করে, “কি হয়েছিল আমার?” দারোয়ান দুজন বলে, “স্যার আপনাকে কইলাম একা ঘুরতে যাবেন না। আপনি কথা শুনলেন না। রাত তখন ২টা, আপনি চেচাইলেন- এ-ই -এ-ই- বলে, আমরা তিন জনাই আপনাকে দেখতে আসি। তখন আপনি

বিছানায় ছটফট করছিলেন। আমরা তিন জনাই আপনাকে চেপে ধরেছিলাম। গা তখন আপনার স্বরে পুড়ে গেছিল। রান্নার ছেলেটি, হাবল তখুনি আপনার মাথায় জল দেয়, আর পাথর বাতাস দেয়। আমরা দুজনেই তখন দেবতারে ডাকতেছিলাম। আবার একটু পরে, বাঁ-চা-ও -বাঁ-চা-ও- করে বিকট আওয়াজ করলেন, সারারাত জেগে বাবু, শেষে যখন- জল- জল- বললেন তখুনি আপনার তাপটা কমেছিল, তাই জলটা খাইতে পেলেন”, বলে হারাধন আর সেনাই দুই দারোয়ান কেঁদে উঠল। বাড়ি থেকে কত দূরে এক পাহাড়ি জঙ্গলে নিম্নরাত্রে এই সরল মানুষগুলোর মমতা ও সেবায় মহাদেবও নিজেকে সামলাতে পারলো না, শ্রী ঠাকুরকে স্মরন করে সকলের যাতে ভালো হয় সেই প্রার্থনা করল।

হাবল দৌড়ে রান্নাঘরে চলে গেল, স্যার এর জন্য হাল্কা খাবার করতে। হারাধন আর সেনাই জিজ্ঞাসা করে, “বাবু এখন কেমন লাগছে?”

মহাদেব একটু অন্যমনস্ক ছিল রাতের স্বপ্নের চিন্তায়। বলল, “দেবালয়ে কেউ খারাপ থাকেনা রে। তোরা আমার দেবতারে- তোদের আমি কি বলবো জানিনারে”, বলেই কেঁদে ফেলে। তারপর সামলে নিয়ে বলে, “স্যার, এখন একদম ফিট”, বলে একটু হাসে। দারোয়ান দুইজন উপরের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করে।

সকাল বেলা, সূর্য উঠতেই হারাধন ও সেনাই কি করবে বুঝতে পারে না। স্যার এর শরীর ভালো নেই, একটু পরেই স্যার এর অফিস এর গাড়ি চলে আসবে, তখন! এই শরীরে স্যার কি করে অফিস যাবে!

আজ নাকি স্যারকে অফিসে যেতেই হবে! তাহলে উপায়! অন্তত স্যার কে একবার ডাক্তার তো দেখাতে হবে। সেও সেই অফিসে যেতেই হবে। এখানে তো ডাক্তার আসবে না। তাহলে!

হারাধন- “শোন, সেনাই তুই আপিসে এ চলে যা। আপিসে সব গিয়ে সব ক, আমি স্যারকে দেখবু।”

সেনাই- “খাম দেখিনি, তুই নাকি সেবা দিবি, কাল রাতে তো তুইই আরেকটু হলেই ভিল্লি খাইতিস। আর হাবলতো খোকা, বয়স কম। ও কী একা পারবে? না হয় তুই যা ক্ষণ। আমি এইখানে রইচি।”

এসব কথা চলছে। হঠাৎ করে মহাদেব, টলতে টলতে কটেজের বাইরে এসে দাঁড়ায় ও সূর্যদেবকে প্রণাম জানায়। হারাধন ও সেনাই ঘাবড়ে গিয়ে.....

“স্যার..... স্যার ....., বাবু..... একি করছেন! মাথা ঘুরি যাবিজি।”

হাবল, দৌড়ে এসে পা ধরে, “স্যার কথা শোনেন, আপনার শরীর ভালো নাই, ঘরে পাকার হাওয়া খান, বাইরে কেন আইলেন বাবু?”

মহাদেব হাবলকে দুহাতে ধরে তুলে বুক জড়িয়ে ধরে। বলে, “চুপ কর, শুধু আমাকে একটা চেয়ার এনে দে, বাইরে বসবো।”

হাবল, চেয়ার আনতে গেল। মহাদেব, হারাধন আর সেনাই দুজনকেই ধরে আলিঙ্গন করে বলে, “ভয় কেটে গেছে- তোরা তো আছিস- অফিসে আজ প্রচুর কাজ- কে করবে? যেতেই হবে। আর ডাক্তার একবার দেখিয়ে নেবো- যদিও জানি আর কিছু নেই।”

হাবল চেয়ার এনেদিলে মহাদেব আরাম করে বসে। তারপর পিছনে হেলান দিয়ে চোখটা বন্ধ করে। হারাধন, সেনাই, হাবল সবাই ভয়ে ভয়ে এর- ওর দিকে তাকায়।

মহাদেব বলে, “জানিস শত অসুখ হলেও সকালের স্নিগ্ধ এই রোদ্দুর সবার নেওয়া উচিত। বড় বড় ওষুধের থেকেও ভালো কাজ করে। এই সূর্য হচ্ছে আমাদের আরেক দেবতা। তার আলো ছাড়া আমরা কেউ বাঁচব না।”

এসব কথা হচ্ছে, তখন সকাল সাতটা। ধীরে ধীরে রোদের তাপ বাড়ছে। তিন অনুচর, অবাক হয়ে স্যারের কথা শুনছে। হঠাৎ মহাদেবের মনে পরে, “আরে তোরা সকালে খেয়েছিস তো? এই হাবল সকালে চা টা খুব ভালো হয়েছিল রে, একেবারে খাসা। যাই হোক, হারাধন আর সেনাই তোরা স্নান খাওয়া করে নে। আজ অফিসে প্রথম দিন। দশটায় গাড়ি আসবে। অফিস যেতেই হবে। আর হাবলু সোনা তুই আমার জন্য শুধু একটু গরম ভাত আর সন্ধি দিয়ে পাতলা ডাল করে দে। অনেক কাজ বাকি রে।”

কথামতো সবাই নিজে নিজে তৈরি হয়ে গেল। অফিসের গাড়ি চলে এলো।

জুতো পড়তে গিয়ে মহাদেব একটু রেগে গেলো, “জুতোয় এতো ধুলো কেন?” জিজ্ঞাসা করে মহাদেব।

হারাধন তাড়াতাড়ি মুছে দেয় ধুলো।

সময়মতো মহাদেবের অফিসের গাড়ি চলে আসে, চারদিকটা খাঁচায় মোরা একটা জিপ। ততক্ষণে অনেকটা চনমনে হয়ে উঠেছে মহাদেব। গাড়িতে একে একে হারাধন, মহাদেব উঠে বসে। নিয়ম অনুসারে অফিসে একজন দারোয়ানই সাথে থাকতে পারে। আর সাথে নিতাই বয়সে একটু বড়, তবে পাশের গ্রামের। কপালে লম্বা তিলক, কাটা যেন সত্যি সত্যিই নিতাই।

গাড়িতে উঠে সামনের সিটে মহাদেব, পিছনে বন্ধুক হাতে হারাধন। গাড়ি চলতে শুরু করে, কখনও পাথরে, কখনও ঘাসে, জঙ্গলে, কখনও আবার ছোট ছোট জলস্রোতের উপর দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলে। মহাদেব চুপ চাপ বসে চারদিকটা ভাল করে নিরীক্ষণ করে। একটু বেশি গম্ভীর আজ মহাদেব।

প্রায় এক ঘন্টা পর অফিসে পৌঁছালো গাড়ি। নিতাই বলে, “স্যার চলে এসেছি, আসুন।” হাইওয়ের ধারেই অফিস, আর কিছু ছোট খাটো দোকান, তারপর আবার জঙ্গল আর জঙ্গল। হারাধন চট করে নেমে মহাদেবকে নামাতে এগিয়ে আসে। মহাদেব হারাধনের ঘাড়ে হালকা হাত রেখে বলে, “ভয় নেই ঠিক আছি। যাই, আজ কাজ গুলো সেড়ে তাড়াতাড়ি ফিরবো দেখি।” হারাধন হাতে একটা অদ্ভুত সুন্দর সাদা ফুল পকেট থেকে বের করে মহাদেবকে দেয়, বলে, “এই ফুল খুব ভাল আমনার আর বিপদ হবেনা।”

নিতাই চমকে উঠে বলে, “স্যার স্যার সাবধান এই ফুল নেবেন না। এ এই জংলি ফুল আদিবাসিরা সব পূজা আরচা করে- এর চরম উগ্র সুগন্ধ আর নেশা লেগে যায়।” হারাধন কাঁচুমাচু করে ইতস্তত করে। মহাদেব নিতাইকে হাত ঈশারা করে খামতে বলে। হারাধনের হাত থেকে ফুল নিয়ে মাথায় ও বুকে ঠেকাই মহাদেব।

প্রথম দিন অফিসে ঢোকান মুখেই সমস্ত ছেলে মেয়ে ছোট বড় মানুষেরা বরণ ডালায় ফুল নিয়ে মহাদেবকে স্বাগত জানায়। মহাদেবের কপালে চন্দন ফোঁটা দিয়ে বরণ করল এক বৃদ্ধা। মহাদেব তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। সবাই আনন্দে আত্মহারা, যেন কতদিন পর এক আপনজন এসেছেন অফিসে।



অফিসে ঢোকায় সময় দরজায় প্রণাম করে মহাদেব অফিসে ঢোকে। এটা মহাদেবের চিরকালের নিয়ম। মহাদেবের বিশ্বাস, সবই শ্রী ঠাকুরের আশীর্বাদ। তাই এই অফিসও তারই সাজানো।

মহাদেবের এহেন আচরণে সবাই হঠাৎ চুপ করে যায়। শুধু বৃদ্ধা মানুষটি শঙ্খধ্বনি করে ওঠেন।

মহাদেবের শরীরে এবারে যেন আবার আগের ক্ষমতা ফিরে আসে। ধীরে ধীরে অফিসটা দেখতে দেখতে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে। সবাই এক এক করে স্যারকে দেখা করতে আসে, সাথে একটা করে উপহার নিয়ে। মহাদেব এবার একটু কড়া ধমক দিয়ে বলে, “এগুলি এবার বন্ধ করুন, চটপট কাজ গুলো করুন আর আমাকেও কাজগুলো করতে দিন। আমি আজ এসে তো চলে যাচ্ছি না। আমি তো থাকছি। কেন এইভাবে সবাই উঠে চলে আসছেন!”

প্রায় তিন ঘন্টা, টানা কাজ করে অনেকটা কাজ মহাদেব গুছিয়ে নেয়। এবার টিফিনের সময়ে নিতাই এসে জিজ্ঞাসা করেন, “স্যার কি খাবেন? কিছু নিয়ে আসব?” মহাদেব বলে, “না, আমি টিফিন নিয়ে এসেছি।” নিতাই চলে যাচ্ছিল। মহাদেব এবার ডাকে, “আচ্ছা নিতাইদা এখানে তোমাদের ডাক্তার কে আছেন?” নিতাই জিজ্ঞাসা করে, “কেন স্যার শরীর খারাপ?” মহাদেব বলে, “না ঠিক তা নয় একবার প্রেসারটা দেখাব।” নিতাই চলে যায়। মহাদেব নিজের টিফিন করে আবার নিজের কাজে মন দেয়। খানিকক্ষন পর স্থানীয় হাসপাতালের এক ডাক্তার এসে উপস্থিত।

সামান্য সৌহার্দ্য বিনিময় করে ডাক্তারবাবু মহাদেবকে একটা আলাদা ঘরে নিয়ে ঢুকলেন।

সবকিছু এক এক করে পরীক্ষা করেন ডাক্তারবাবু, তারপর একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, “সবই তো স্বাভাবিক, তবে নাড়ীটা একটু দ্রুত চলছে।” মহাদেব মাথা নাড়ে।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন, “সত্যি করে বলুনতো কি হয়েছিল?” মহাদেব খুব সংক্ষেপে স্বপ্ন নিয়ে কয়েক কথা বলে, তারপর হেসে বলে “এই আরকি।” স্বপ্নের কথাটা কৌশলে এড়িয়ে যায়।

ডাক্তারবাবু বলেন, “আপনার নামে তো অনেক গল্প শুনছি, খবরেও দেখছি আপনার অনেক সাক্ষাৎকার। আমি তো আপনার খুব বড় ভক্ত। আজকের দিনে আপনার মত মানুষ পাওয়া সত্যি মুশকিল।” মহাদেব একটু অপ্রস্তুত ও লজ্জায় পরে যায়।

মহাদেব এবার বলে, “এভাবে কেন বলছেন আপনিও তো কত ভালো নাহলে লোকে তো কত বাজে কথাও বলে, আবার দেখুন আপনি আমার প্রশংসা করছেন। নিজে ভালো হলে সবাই ভালো বুঝলেন ডাক্তারবাবু।” ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, “জানি জানি স্যার, আপনি হলেন স্বামীজির অঙ্ক ভক্ত, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের আদর্শে দীক্ষিত।”

সব দেখা শেষ হলে, দুজনেই হাতজোড় করে নমস্কার করে। যাবার সময় ডাক্তার নিজের মোবাইল নম্বরটা দিয়ে বলেন দরকার হলে বলবেন।

মহাদেব এবার কাজে বসেছে হঠাৎ মনে পরে হারাধনের কথা ও সাথে সাথে, একজনকে ডেকে বলে, “হারাধনকে এখানে পাঠাও তো।” লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে বলে, “স্যার গার্ড এর অফিসের ভিতরে ঢোকা নিষেধ।” মহাদেব চমকে উঠে বলে, “একি মানুষ মানুষের কাছে আসবে এতে আপত্তি? কোন বইয়ে এর বিধি নিষেধ আছে দেখি।”

লোকটি দেওয়ালে টাঙানো একটি মাঝারি মাপের হোর্ডিং এর দিকে দেখায়। মহাদেব দেখল, সত্যি এখানে এইসব বিধিনিষেধ আছে। মহাদেব চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে হোর্ডিং টা খুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিল। লোকটি হতবশ্ব- “স্যার- স্যার- একি করলেন!” মহাদেব বলে, “আজ থেকে আমি যা বলব সেটাই নিয়ম।” মহাদেব, রেগে গিয়ে চিৎকার করে ডাকে, “হারাধন! হারাধন!” সঙ্গে সঙ্গে, নিতাই এসে হাজির। জিজ্ঞেস করে, “স্যার কি হয়েছে? এত উতলা কেন আপনি?”

“আমি হারাধনকে ডাকছি তোমায় নয়”, বলে অফিসের বাইরে হারাধনকে ডাকতে আসে। নিতাই ছুটতে ছুটতে এসে বলে, “স্যার ও তো চলে গেল, আমি আছি বলুন কি বলছেন।”

“হারাধন চলে গেল- আমায় না বলে- হতেই পারে না”, মহাদেব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে। নিতাই কাঁচুমাচু করে বলে, “স্যার ও একটু ঐরকমই। ছেড়ে দিন স্যার আপনার কাজ হয়ে গেলে বলবেন, আমি তো আপনাকে গাড়ি করে দিয়ে

আসব।” মহাদেব রাগে অন্ধ হয়ে যায়, নিজের হাত দুটি মূঠী করেও নিজেকে সামলে নেয়। তারপর বলে, “আজকের কাজ আমার শেষ।” দুপুর তখন ৩টে, সবাই অবাক। “এখনই কাজ শেষ কি বলছেন স্যার?” একজন জিজ্ঞাসা করেন। মহাদেব দেন উত্তর দেয়, “হ্যাঁ আমার একটা বিশেষ কাজ ভুলে গেছি, একটা ফাইল কটেজে ফেলে এসেছি। তাই আবার কাল আসব, এসে বাকিটা করে দেব। আপনারা আপনাদের কাজ ঠিক মত করে দিনের আলো থাকতে থাকতেই বেরিয়ে যাবেন। চারদিকে তো ঘন জঙ্গল।” নিতাই চটপট গাড়ি চালু দিয়ে বলে, “চলে আসুন স্যার।” মহাদেব নিতাইকে বলে, “গাড়িটা অফিসেই রেখে দাও। সরকারি গাড়ি আমার চাইনা। আমার চাই মানুষ, প্রকৃত মানুষ।”

নিতাই মাথা নিচু করে কাঁপতে থাকে। বলে, “স্যার তাহলে বাড়ি .....” নিতাই কে খামিয়ে মহাদেব বলে, “হ্যাঁ চলো তুমি আমাকে পায়ে হেঁটে পৌঁছে দেবো।” চমকে ওঠে নিতাই, “স্যার, জঙ্গলে বাঘ- সিংহ কত কি আছে! কি করে অতটা পথ হাঁটবো- মানে, আপনি হেঁটে যাবেন- চলুন না গাড়িতে করে পৌঁছে দিই।”

“হারাধন, খেয়েছিল দুপুরে- ও কি করে বাড়ি গেল, খাঁজ নিয়েছেন?” মহাদেব জিজ্ঞাসা করে। নিতাই বিপদ বুঝে বলে ওঠে, “হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার টিফিন করেছে। তারপর এই রাস্তাতেই হাঁটা দিয়েছে। চলুন গাড়িতে ওকে তুলে নেব।” বৃদ্ধা মানুষটি অনেকক্ষন ধরে নাটকটা আগাগোড়া দেখছিল- দেখছিল অফিস এর সব কর্মচারীরা। বৃদ্ধা এগিয়ে এসে মহাদেবের হাতদুটো ধরে বলে, “আমি প্রথমেই বুঝেছিলাম তুমি আমাদের দেবতা, আমাদের রক্ষাকর্তা।”

তারপর কালবিলম্ব না করে নিতাই মহাদেবকে গাড়িতে তুলে তাড়াতাড়ি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। জঙ্গলে ঢোকার মুখেই মহাদেব চিৎকার করে বলে, “হারাধন, ওই তো হারাধন।” হারাধন একটা গাছের তলায় মুখ নিচু করে বসেছিল। একগাল হেসে নিতাই বলে, “এই হারু চলে আয়, বাড়ি যাব।” হারাধন যেন ইতস্তত করছিল। নিতাই আবার বলে, “চলে আয়, চল-চল দেরি হয়ে যাচ্ছে।” তারপর হারাধন গাড়িতে উঠলে নিতাই একঘন্টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে দেয়। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে নিতাই মহাদেবকে স্যালুট ঠুকে বলে, “আসছি স্যার। কাল আবার একই সময় চলে আসব।”

বিকেল তখন সবে মাত্র সাড়ে চারটে। মহাদেব আর হারাধন কিছুক্ষণের মধ্যে হাত পা ধুয়ে বাড়ির পোশাক পরে নেয়।

তারপর মহাদেব, নিজে চেয়ারটা নিয়ে বাইরে একটু বসে। সেই একই ভাবে পিছনে হেলান দিয়ে। হারাধন বলে, “স্যার কিছু খাবেন?” মহাদেব কি যেন ভাবছিল। বলে, “হ্যাঁ কিছু তো খেতেই হবে। তোমরা এই সময় কি খাও, আজ সেই খাবার আনোতো।” শূনে, হারাধন আর হাবল, চোখ চাওয়া চাওয়া করে- চোখ দুটো তাদের জ্বলজ্বল করে ওঠে আনন্দে। হাবল জিত্তাসা করে- “স্যার ঐ খাবার আপনি খাবেন? ওটা তো এখানকার কলাই ভাজা আর বড় গেলাসে চা। উ খেয়ে আপনার পেট ভরবে নাই।”

মহাদেব কড়া গলায় বলে, “হাবল যা বলছি তাই কর।” শূনে হাবল চটপট রান্নাঘরে চলে যায়। সেনাই বাড়িতে ছিলনা, একটু পরে ঘরে ফেরে। তখন গোধূলি লগ্ন, চারপাশটা বাহারি রঙে রাঙিয়ে উঠেছে। দূরদিগন্তে বিহঙ্গদের সারিবদ্ধ ঘরে ফেরার দৃষ্টি নন্দন আলপনা। গাছে-গাছে পাখিদের কিচির-মিচির আবার বেড়ে যায়, সবাই ঘরে ফিরছে তার আনন্দে। এদিকে, হাবল রান্না করে নিয়ে চলে আসে। সেনাই প্রশ্ন করে, “স্যার আজকে আপনি এত ত্যাগাত্যাগি ফিরে এলেন। অবশ্য আমিও - কেনে জানিনা - মন কেমন করতছিল, এ এই বনদেবতারে সাক্ষী রেখে বলছি।”

হারাধন মুখে আঙুল দিয়ে সেনাইকে থামতে বলে। সেনাই কিছু বুঝতে পারেনা, শুধু অবাক হয়ে সবার দিকে তাকাই। মহাদেব চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে বসে বলে, “নে হাবল, সবাইকে ভাগ করে দে, সেনাই হাত লাগা, আগে থা, পেটে খাবি তারপর কথা।” সবাই আবার আপ্রস্তুত, বলে-“স্যার মাটিতে কেনে উঠে বসেন।” মহাদেব, এবার কড়া গলায় ধমক দেয়। বলে, “তোরা কি চুপ করবি? এই মাটি কি তোদের নিজেদেরই শুধু অধিকারের নাকি! বাপরে বাপ! বক-বক-বক-বক করে শুধু মাথা খাস তোরা।”

সবাই আবার খতমত খেয়ে গিয়ে -“আজ্ঞে না না- ছিঃ ছিঃ- উ কতালয় স্যার, মানে ইয়ে-”

মহাদেব, আবার কড়া গলায়, “-আবার এবার কি চুপ করবি?” সবাই একসাথে বললে ওঠে, “-হ্যাঁ হ্যাঁ, বইসবেন না কেনে- যখন খুশি তখনই আপনি বইসবেন- ই আর কি বইলতে আছে নাকি-”

“-ই মাটি, ই জঙ্গল আমাদের সকলের আছে বইকি”- বলে হারাধন, সেনাই ও হাবল চুপ করে। মহাদেব মনে মনে মুচকি হাসে, আর অবাক হয়ে ভাবে

এই মানুষগুলির অকৃত্রিম ভালবাসার কথা। কথার কায়দায় সবাইকে চুপ করালেও ওদের মানবিক সারল্যে মুগ্ধ হয়ে যায় মহাদেব।

যেন কত জন্মের পর, কত তারাজগলি, নীহারিকা পেরিয়ে আজ মহাদেব পেয়েছে তার একান্ত আপনজনদের। কখন যে, চারদিক থেকে, মহাদেব আরও বেশি মায়ার বাধনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে, মহাদেব নিজেও জানেনা।

এবার শুরু হল, গরম চায়ের সাথে অনবদ্য স্বাদের বন্য কলাই ভাজা দিয়ে সান্ধ্যকালীন স্বপ্ন আহার। স্বাদের মাধুর্য এতটা তীব্র যে মহাদেব মাঝে মাঝে আঙ্গুল চাটতে থাকে। তাই দেখে তিন অনুচরের ফিক ফিক করে হাসি আর ধরেনা। মহাদেব, সেটা বুঝেও না বোঝার ভান করে জিজ্ঞেস করে, “কি হল রে?”

সেনাই একটু ঠোঁট কাটা। বলে, “বাবু, আপনি যেমনে আমাদের সনে বইসা আনন্দ কইরে খিলেন, আবার আঙ্গুল চাটছেন; ইয়ে, মানে – কেউ তো ইরম – মানে- আমরা আগে কুনো বাবুকে দেখি নাই, তাই, ঐ ঐ হাবলাটা আমাকে খুচিন দিলো, আর আমার হাসি বেরিন গেলো।” সেনাই হাত জোর করে বলে, “আমাদের খেমা দিবেন বাবু।”

মহাদেব বলে, “সত্যি রে, এই কলাইটা আগে কখনও খাইনি, এই নুন দিয়ে খেতে দারুণ লাগল।” আবার বলে, “- আর হাসবিনা কেন রে – তোদের হাসি, আনন্দ, আমার যে ভীষণ ভাল লাগে - প্রাণ খুলে হাসবি, লোককে হাসাবি। তোদের এত কষ্ট, তাও তোরা আমার জন্য এত করিস, তোদের উপর আমি কেন রাগ করব?”

স্বপ্ন-ভাষী হারাধন হঠাৎ বলে ওঠে, “বাবু, ই সব তো আমাদের চাইকরি, ইতো আমরা সব বাবুদের লগেই করিচি; আপনি শুদু কেমন যেন- কেমন কেমন কথা কন – কলিজাটা ভরি যায়, মনে খুব ভালো লাগে, মনটো কিরম করে -” বলতে বলতেই হারাধনের চোখের কোনা দুটো অন্ধকারে চিক -চিক করে ওঠে, উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে ওঠে “-শুধু ঐ - ঐ-” সেনাই চট করে হারাধনের মুখটা চেপে ধরে থামিয়ে দেয়। হারাধন অনেচ্ছন মাথা নিচু করে হাঁপাতে থাকে, ও ধীরে ধীরে চুপ করে শান্ত হয়।

বেশ কিছুক্ষন, চারজন মিলে জঙ্গলের আদিম নিখাদ গোধূলি লগ্নকে সারা গায়ে, মনে, প্রাণে মেখে তাকে টা টা বাই বাই জানিয়ে বন্য সন্ধ্যাকে আমন্ত্রন জানায়। হারাধন যে ভীষণ নরম মনের ও ভীষণ আবেগ প্রবন প্রানের মানুষ

মহাদেব তা আগেই আঁচ করেছিল। মহাদেব, এদের সরলতা ও মানবিকতায় মুগ্ধ হয়ে অনেক কিছুই মনে মনে ভাবছিল। মহাদেবের সেই চিন্তাগুলো ধীরে ধীরে সজীব হচ্ছে।

এদিকে সন্ধ্যা যত বাড়ছে, অন্ধকার তত গাঢ় হয়ে ঘনাচ্ছে। বন্য জন্তুদের হুস্কার-গর্জন, শেয়াল কুকুরের ভূতুরে আওয়াজ করে কান্না, গায়ে শিহরণ জাগানো রাত পাখিদের বন্য সুরে ডাক, ঝি ঝি পোকার অবিরাম শব্দে সেই বন্য আদিমতায় জঙ্গল আবার স্বমহিমায় জাগ্রত হয়ে ওঠে।

মহাদেব অনেক কিছু তার অনুচরদের বলতে চায়, বোঝাতে চায়; কিন্তু পরে ভাবে - না থাক - এখনই না - সময় হলে পরে বলবে। পরে মহাদেব বলে “হারাধন চলা ওঠো, উঠে এবার একটু সন্ধ্যাটা দিয়ে দাও, সাঁঝ বাতির সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, আর বাইরে থাকাও ঠিক না। সবাই ভিতরে চলো।”

হারাধন নিত্যদিনের মত, ঘরের বারান্দার ঈশান কোণে, একটা পাথরের উপর মাটির টবে বসানো হরি গাছে একটা ধূপ দিয়ে প্রণাম করে। একে একে সকলে ভক্তি ভরে প্রণাম করে, মহাদেবও শেষে নতজানু হয়ে হাতজোর করে শ্রী ঠাকুরকে স্মরণ করে ভক্তি ভরে প্রণাম করে। তারপর সকলে ঘরে ঢোকে ও সদর দরজা খিল দিয়ে দেয়।

মহাদেব তার নিজের প্রাত্যহিক অভ্যেস মত নিজের ডাইরিটা খুলে পেন নিয়ে বসে। ওদিকে তিনজন আপন আপন কাজে লেগে যায়। মহাদেব সারাদিনের যাবতীয় ঘটনাগুলো একে একে লিপিবদ্ধ করতে বসে।

এমন সময়, হঠাৎ হারাধন দরজার সামনে করজোড়ে কাঁচুমাচু করে এসে দাঁড়ায়; মহাদেব একটু বিব্রত হয়ে, হারাধনের এরকম আবস্থা দেখে, জিত্তেস করে, “-আরে হারাধন! বল - কি হল- এরকম ভয়ে ভয়ে! এত ভয়ের কি আছে? তুমি নিশ্চিন্তে খুলে বল, কোনও ভয় নেই।”

হারাধন বলে, “বাবু সকালের ঐ ফুলটা, মানে সকালে ঐ আপিসে, ঐ সাদা ফুলটা, উটা কুনো খারাপ ফুল নয়কো।” বলে হারাধন ইতস্তত করে।

মহাদেব হেসে বলে, “-ও এই কথা? আমি কখন তোমাকে আমি সে কথা বলেছি ওটা খারাপ ফুল?” তারপর, মহাদেব উঠে নিজের জামাটা নিয়ে পকেট থেকে সাদা ফুলটা বের করে বলে, “এটা আমার পকেটেই আছে এবং থাকবেও,

যতদিন এখানে থাকব।” হারাধন এবার একটু হাসে তারপর মাথা নেড়ে নমস্কার করে। মহাদেব আবার হারাধনকে আশ্বস্ত করে বলে, “তোমাদের কোনও ভয় নেই। আর নিতাই যেই হোক, যেমনই হোক ও তোমাদের সাথে আর কোনও খারাপ কাজ করতে পারবেনা- অন্তত আমি এখানে থাকতে কোনওদিন নয়।” মহাদেব বলেই চলে –“আজ নিতাই যে তোমাকে অফিস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আমি সে কথা জানি। তবে আবার বলছি, ভয় নেই ও আর কোনও দিন, তোমাদের কাউকে আপমান করার সাহস পাবে না।” মহাদেব এবার আরও উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, “সব সময় জেনে রেখো, আমি মানুষকে ভালবাসি, মানুষ। আর মানুষের গায়ের রং আর চামড়া থাকলেই সবাই মানুষ হয় না, অন্তর, হৃদয়, বিবেকটা যাদের মানুষের, তারাই হচ্ছে প্রকৃত মানুষ। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে স্বয়ং ভগবান বিরাজ করেন। তাই যে মানুষকে আপমান করে সে স্বয়ং ঈশ্বরকে আপমান করে, সে কখনও মানুষ নয়। আর আমি এখানে আসার আগে এই অফিসের সমস্ত কিছু জেনে শুনে এসেছি। শুধু এই জঙ্গলটা সম্পর্কে সেরকম কিছু জানিনা। তাই বলছি, এই জঙ্গলের বাইরের কোনও শক্তি তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।”

এইবার হারাধনের মুখে এক গাল হাসি, সরল শিশুর মত হেসে ওঠে। মহাদেব এগিয়ে গিয়ে হারাধনকে বুকে জরিয়ে ধরে। হারাধন এবার স্বাভাবিক হয়, ও বলে, “বাবু আপনি আমাদের জইনে এত কইরচেন, আমাদেরও আর ভয় নাই। তবে বাবু একটা কথা আপনি ঠিক বুলেচেন, উই আপিসটা আপনি চিনলেও জঙ্গলটা আপনি এখনও অনেক কিছুই জানেননা। তবে আমরা থাইকতে জঙ্গলে আমনারও কুনো বিপদ হুইবেনা, ই কতাটা আপনি বিশ্বাস কইরতে পারেন।” হারাধন আরও বলে, “-উই নিতাই মাথায় তিলক কেটি নিজে দেবতা ভাবে, আমাদের দিখতে পারেনা,” – মহাদেব থামিয়ে দিয়ে বলে, “- বললাম তো ও আর কিছু বলবেনা, তবে এই জঙ্গলটা আমাকে সত্যি আরও ভালো করে জানতে হবে। আর তোমরা যখন সাথে আছো ঠিক চিনে ফেলব কি বলো?” হারাধন উত্তেজিত হয়ে বলে “একদম, কুনো চিন্তা নাই।”

সেদিন রাত্রে সবাই মিলে একসাথে খুব হাসি ঠাট্টা মজা করে খাওয়া দাওয়া হল। মহাদেব ধীরে ধীরে ওদের কাছে আরও আপনজন হয়ে উঠছে। এবার শোবার পালা, মহাদেব বিছানায় শুয়ে এটা সেটা অনেক কিছু ভাবছে। এক দিকে আগের রাতের বিভীষিকা, অফিসের কিছু অসাধু লোকেদের অত্যাচার আর অন্য দিকে এই তিন জনের নিখাদ ভালবাসায় মহাদেবের মাথায় সব তালগোল পাকিয়ে

যাচ্ছে। স্বরটা নেহাতই কাকতালীয়, সেকথা মহাদেবও জানে এমনকি ডাক্তারও তাই বললেন যে কিছু হয়নি। চিন্তার বিষয় এখন আনেকগুলি। এক, হঠাৎ করে এক দিনের সামান্য ঘোরাঘুরিতে স্বর কেন এল? দুই, মহাদেব, স্বপ্নের মধ্যে এমন অনেক জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে যা কোনও দিন সে দেখেনি। যাদেরকে স্বপ্নে মহাদেব দেখেছে- কথা বলেছে- তারা কারা! ঐ বুড়োটা আর ঐ বিশালদেহী নিকষকালো মানুষটা, বা ঐ জঙ্গলে নাচ-গান হচ্ছিল, সামনে, কি যেন একটা ছিল! মনে পরছে না। বিজ্ঞান যে বলে মানুষ যা সত্যানে দেখে ঘুমের ঘোড়ে অবচেতন মনে সেগুলোই মানুষ স্বপ্নে দেখে। এছাড়া এমন কিছু নতুন ঘটনা মানুষ দেখে যেগুলো কল্পনা হতে পারে বা হতে পারে ভবিষ্যতে হতে বা ঘটতেও পারে। সেটার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। আবার এমনও হতে পারে সবগুলোই মহাদেবের বন্য প্রেমের ফল! হ্যাঁ, হতেই পারে! তবে! নাহ, তাও মনে যেন শান্তি মিলছে না।



## ২। মহাদেবের বাঘ শিকার

এমন সব মহাদেব ভাবছে। চোখে ধীরে ধীরে ঘুম জড়িয়ে আসছে।

হঠাৎ করে বাইরে এক হার হিম করা বিশাল গর্জন শোনা গেল- সঙ্গে এক আর্ত চিৎকার। কিন্তু কোনও কথাই পরিষ্কার বোঝা যায় না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্বাপদের গর্জন ও মানুষটার চিৎকার কটেজের পিছনের দিকের জঙ্গলে মিলিয়ে যায়।

সর্বনাশ!! সর্বনাশ হয়ে গেছে।

মহাদেব বিছানা ছেড়ে ধরফরিয়ে উঠে ঘর থেকে বন্দুক নিয়ে বেড়তে যায়, কিন্তু মহাদেব দেখে তার তিন অনুচর, দরজা আগলে দাঁড়িয়ে। সবাই একবাক্যে মহাদেবকে থামতে অনুরোধ করে। হাত জোর করে হাবল মহাদেবের পায়ে জরিয়ে ধরে কাঁদতে থাকতে থাকে। হাবল বলে, “স্যার আপনি যাবেননা, বাঘের মুখে গেলে-” মহাদেব হাবলকে হাতে ধরে তুলে এক ধমক দিয়ে বলে “- চুপ কর, চুপ।” এদিকে হারাধন ও সেনাই দুজনের চোয়াল শক্ত, দাঁতে দাঁত চেপে একটু গম্ভীর গলায়, দুজনেই বলে “বাবু, একটা বড় বিপদ হইগিছে, হাবল ঠিক কতা বুলছে, এখন বাইরে যাবেননা- একদম না।” মহাদেব বুঝতে পারে তাদের ভয়ের কারণ। কিন্তু দেরি করলে সব শেষ হয়ে যাবে। মহাদেব এবার বন্ধুকটা তাদের দিকে তাক করে হুঙ্কার দেয়, বলে, “ভালো বলছি তোরা সবাই সরে দাঁড়া, নাহলে সব শেষ হয়ে যাবে, তোদেরকেও ছাড়বনা, আমাকে যেতে দে, সরে দাঁড়া বলছি, আমি বেরোবো।” সেনাই, হারাধন ও হাবল এবার ভয় পেয়ে সরে যায়। মহাদেব এবার কোনও দিকে না তাকিয়ে বন্দুকের নলে গুলি ভরে নেয়, তারপর সেটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। দরজার কোণা থেকে বড় লম্বা ছোরাটা ও ছোট টর্চটা কোমরে গুজে নেয়।

হঠাৎ করে, মহাদেবের একরম দুঃসাহস দেখে সেনাই চিৎকার করে ওঠে, “- হ্যাঁ বাবু আমরাও যাবো, কারু বিপদ হল আর আমরা ঘরে কেনে থাকব! ই কেনে হবে? আমরা তারে বাঁচাইতে যাবো, যেতেই হবে।”

হারাধন চোয়াল শক্ত করে ধরা গলায় বলে ওঠে “ই তো ইখানে মাসে এক দুইটা ঘটি যায়, কেও জানতেও পারে নাকো-,” তাপরই থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে হারাধন গম্ভীর গলায় মহাদেবের প্রতি বলে, “-আর, আপনি নিজে বুলছেন যাব, কেও তো আগে ইরম বলে নাইকো, অনেক বাবুরে অনেক সেবা দিচি, কিছু পাই নাই, কিছু দেয় নাই শুদু বকা দিচে -” হারাধন নিজের আবেগকে আর ধরে রাখতে না পেরে বলে ফেলে, “- আপনি এই জঙ্গলের বনদেবতার নিম্চই কেও আচেন, আমি ঠিক চিনিচি নাইলে এত দয়া কেনে আপনার?” বলে হারাধন চটপট মশালটা জালিয়ে নেয় ও হাবলকে কড়া গলায় বলে, “হাবল শুনে রাখ এই আমরা বাঘের সাথে লড়াই এ যাচ্ছি, কুনো ভয় নাই, শুধু আমরা না ফেরা পর্যন্ত বনদেবতাকে ডেকে যাবি। কারুর কোনো ক্ষতি হবেনা।”

সেনাই হাতে বিশাল বল্লমটা সাথে নেয় ও একটা ছোরা কোমরে গোঁজে।

হাবল ভয়ে কঁদে ফেলে “ও ঠাকুর গো, ও বনদেবতা গো সবাইকে ভালো করো, কারু কুনো ক্ষতি যেন না হয়।”

মুহূর্তের মধ্যে তিনজন গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে পরে। হাবল ঘরে খিল আটকে ঠাকুর ডাকতে থাকে। ঘরের পিছনের দিকটা এমনি নোংরা, আর ততটাই ঘন জঙ্গল। তাও মাঝখান থেকে চলে গেছে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে একটা ছোট নালার মত জলধারা। এটা কিছুদূর গিয়েই একটা বিশাল খাদে পরেছে। এই জলধারা অবধি সব পরিস্কার চেনা ও দেখা যাচ্ছে, টর্চ ও মশালের আলোয়। না এদিকটায় সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছেনা।

হঠাৎ করে সেনাই ফিশ ফিশ করে বলে- “বাবু, দাঁড়ান, দাঁড়ান, কিছু একটো গন্ধ পাচ্ছি।” বলেই শিকারি কুকুরের মত এদিক ওদিক মাটি, জঙ্গলের ঘাস পাতা শুকতে থাকে। হারাধনও ফিশ ফিশ বলে, “হ্যাঁ, ঠিক বুলেছিস, আমার নাকেও আসছে।”

মহাদেব চট করে মাটির উপর ভালো করে টর্চের আলোটা ফেলে বাঘের পায়ের ছাপ খুজতে থাকে। না, মহাদেবের চোখে কিছু পড়লনা।

সেনাই ও হারাধন কিন্তু বেরোয়া, ঠিক যেন শিকার খুঁজছে। সেনাই বলে ওঠে- “পাইছি, পাইছি, বাবু ইদিকে আসেন, ইখানে ইখানে, শয়তানটার পায়ের ছাপ পাইছি।”

মহাদেব ছুটে যায়, দেখে জল ধারার পাশে বেশ কয়েকটা বাঘের পায়ের ছাপ- এখনইকার, তাজা! কিন্তু পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে যেতে সবাই বুঝতে পারে বাঘ মামা এপার এ নেই। জল ধারা পেরিয়ে ওপারে গমন করেছে ব্যাটা। সবাই পা টিপে টিপে দ্রুত জলধারা পেরোতে যায়। একটু বেসামাল হলেই পা পিছলে গিয়ে সোজা গিয়ে পরতে হবে খাদে।

মহাদেব হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটিয়ে নেয়, বাকি দুজনও তাদের লুঙ্গি ধরনের পোশাক পুরো লেঙটির মত পিছনে গুজে পরে নেয়। এবার যতটা সম্ভব নিঃশব্দে জল পেরিয়ে ওপারে ঘন জঙ্গলের সামনে হাজির হয়।

সেনাই ও হারাধন, মুখে আগুল দিয়ে ঈশারা য় মহাদেবকে চুপ করতে বলে। তারপর কানে কানে বলে, “ব্যাটা সামনের ঝোপটায় বসি আচে - জানিনাকো মানুষটো কেমনে আচে?”

মহাদেব চট করে বন্ধুকটা ঘারে তোলে, হারাধন মশালটা শক্ত করে ধরে, সেনাই বল্লমটা তাক করে নেয়, কোনও ভুল ত্রুটি হলে কোনও রক্ষে নেই। কার কপালে কি আছে স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া কেউ জানেননা। সকলে মিলে একটু জঙ্গলের ভিতরে যেতেই সামনের ঝোপটা নড়ে ওঠে। আর দেরি না করে মহাদেব টর্চের আলো ফেলে, হারাধনের মত শান্ত মানুষ, সেও আগুনের ভাটার মত হয়ে স্বলছে। মশালটা তুলে ধরতেই গর্জন, গগন বিদারী কান ফাটানো হুঙ্কার। যেন সে বলতে চাইছে, আর এগিও না, এগোলে বিপদ, সবকে শেষ করে দেব - যেন কত দিনের জমে থাকা রাগ উগ্রে দিচ্ছে বাঘটা। এদিকে হারাধন, সেনাই, তাদেরও চোখে মুখে আগুন- তারাও তাদের জমানো পুঞ্জীভূত ব্যাখা, আক্ষেপ, রাগ সব নিয়ে প্রতিশোধ নিতে মরিয়া।

প্রায় বারো- চোদ্দ ফুট লম্বা একটা ডোরাকাটা রয়াল বেঙ্গল, তার সামনের দুই খাবার নিচে নিখর এক আদিবাসী কিশোর পরে। কিশোরের ঘার বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু শিকার হাতছারা করতে শিকারি নারাজ।

অসহায় কিশোরটিকে দেখে মহাদেব নিজেকে সামলাতে পারে না। এক সেকেন্ড দেরি না করে, বন্দুকের নিশানা লাগায় বাঘটার দিকে, সেনাই হারাধন তারাও বল্লম আর মশাল নিয়ে দুদিকে দাঁড়িয়ে।



### মহাদেব ও বাঘের লড়াই

কিন্তু প্রকৃতির সাধারণ নিয়মেই বাঘ নিজের বিপদ বুঝতে পারে ও নিজেকে বাঁচানোর জন্য এক লাফে মহাদেবের ঘারের উপর ঝাপ দেয়।

মহাদেব কোনও রকমে বন্দুকের নলটা বাঘের মুখে ঢুকিয়ে গায়ের জোরে খোঁচা দেয়। কিন্তু বেসামাল হয়ে গিয়ে গুলি আর বেরলোনা, মহাদেব ড্রিগারটা টিপতে পারল না। মহাদেব মাটিতে পড়ে যায়।

এদিকে মহাদেবের ঘার, হাত, বুক বাঘের ভয়ঙ্কর নখের আঁচড়ে ফালা ফালা হয়ে যায়। রক্তে ভাসতে থাকে মহাদেবের শরীরও। বিপদ গভীর বুঝে নিয়ে,

মহাদেব মনে মনে নিজের ইস্ট দেবতাকে স্মরণ করে, নিজের শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে বাঘটির গলা নিজের দুই হাত দিয়ে জাপটে ধরে বাঘটিকেও ধরাশায়ী করে।

হারাধন মহাদেবের বিপদ দেখে, হারাধন নিজেও বাঘটির উপর ঝাপিয়ে পড়ে, হাত দিয়ে বাঘের সামনের পা দুটো আর পা দিয়ে বাঘের পিছনের পা দুটোকে কোনোরকমে কড়া করে। কিন্তু হারাধনেরও হাত পা, বাঘের নখের আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত।

কিছুক্ষণ, হ্যাত এক মিনিট!

সেনাই সেই ফাঁকে, চট করে আদিবাসী কিশোরটিকে কোলে তুলে নেয়। বুকে জড়িয়ে ধরে ছেলটিকে। তারপর আনন্দে উত্তেজনায় ছিকার করে ওঠে- “বাবু, বাবু, এখনও এখনও ইয়ের পেরান আচে। জয় বনদেবতা জয় বনদেবতা জয় বনদেবতা।”

তারপর মুখে আগুল ঢুকিয়ে অদ্ভুত আদিবাসী ভাষায় চিঁকার করতে থাকে সেনাই- “এ ল ল ল ল ল ল ল ল ল ল আ-এ ল ল ল ল ল ল ল ল ল ল আ।”

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, দূর থেকে শোনা যায়, প্রচুর মানুষের একসাথে হিল্লার আওয়াজ। খুব দ্রুত আওয়াজ আরও কাছে, আরও কাছে কানে ভেসে আসছে। তারপর কটেজের সামনের জঙ্গলটা পুরো জঙ্গলটা আলোয় ভেসে যাচ্ছে। সকল আদিবাসী একসাথে হাজির। হ্যাঁ, সেনাই, এখানকার আদিবাসীদের ভাষায় তাদেরকে ডেকে জড়ো করে, এই চরম বিপদ থেকে তাদের উদ্ধারের জন্য।

নিমেষের মধ্যে, প্রায় দুই তিনশো আদিবাসী চারদিকটা ঘেরে দাঁড়ায়। সবার হাতে লম্বা লম্বা বল্লম, তীর-ধনুক, ছোড়া, আর মশাল। প্রায় সবাই উলঙ্গ, কটিবস্ত্র ছাড়া বেশিরভাগের গায়ে কিছু নেই। সব যেন আগুনের গোলা, মশালের আলোয় মুখগুল সব আগুনের মত জ্বলছে।

মহাদেব, সেনাই, হারাধন, সবাই মনে বল ফিরে পায়।

মহাদেবও বুঝল, শ্রী ঠাকুর যাকে এরা বনদেবতা বলে পূজা করে তিনি এদের ডাকে, কাতর প্রার্থনায় সারা দিয়েছেন।

আঃ, কি শান্তি! চোখ বন্ধ করে মহাদেব শ্রী ঠাকুরকে একটু প্রণাম করে। অনেকক্ষন একভাবে থাকতে থাকতে, এতক্ষনে মহাদেবের হাতদুটো একটু অসার হয়ে এসেছে। বাঘটা আবার নড়ে ওঠে আবার মহাদেবের বুক জোরালো থাবা মারে, বাঘও মরিয়া হয়ে ওঠে- এদিকে মহাদেবও মরিয়া। হারাধন ও মহাদেব আবার জাপটে ধরে বাঘটাকে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে দুজনের গা, তবু বাঘটা শেষ অবধি ছাড়া পায়না।

নিমেষের মধ্যে সেনাইয়ের ঈশারা তে, তাড়াতাড়ি করে বন্য আদিম মানুষগুলি ও সেনাই সবাই মিলে বাঘটাকে বুনো লতার ফাসে বেঁধে দেয়। এরপর কিছুক্ষণের জন্য মহাদেব আবার জ্ঞান হারায়।

# ৩। বনদেবতার আশীর্বাদ ও মহাদেবের নবজীবন

কতক্ষণ এভাবে ছিল, জানা নেই মহাদেবের, চোখ খুললে সে দেখে বিশাল ফাঁকা এক প্রাঙ্গণ, চারদিকে মশাল জ্বলছে। আর তার দুই পাশে হারাধন ও সেই কিশোরটি। শুধু এক বুড়ি নাকি বুড়ো, কে যেন, ঘন ঘন যাওয়া আসা করছে, চোখে ঝাপসা দেখে মহাদেব।

যাই হোক, সেই একই ভাবে অর্ধ-উলঙ্গ এক জন মানুষ, তার অক্পন সেবা দিয়ে চলেছে ঐ তিন জনকে। একটা বড় মাটির পাত্র থেকে ছোট একটা কাপের মত পাত্র দিয়ে, মহাদেবের মুখে হারাধনের মুখে ও কিশোরটির মুখে হাল্কা উষ্ণ এক গরম পানীয় দিয়ে যাচ্ছে, অল্প অল্প করে। ভীষণ বিষাদ, তবু মহাদেব কোনও বিরক্ত না হয়ে তাই বেশ কিছুক্ষণ থাওয়ার পর হাত নেড়ে ঈশারা করে যে আর সে নেবে না। তবে এটা মহাদেব বুঝল যে এটা এক ধরনের লতাপাতা ও ভেষজ গুনের সম্পৃক্ত পানীয়। কারণ এই ধরনের পানীয় মহাদেব আগেও কোথায় যেন খেয়েছে। যা পান করে মহাদেব ধীরে ধীরে চোখে সব পরিষ্কার দেখতে পায়। অসার হাত দুটোতে অল্প হলেও জোর ফিরে পায়। ধীরে ধীরে গায়ে হাতে পায়ে জোর ফিরে পায়। তবে এবার শুরু হয় গোটা শরীরে তীব্র যন্ত্রণা। এবার স্পষ্ট চারদিক।

দেখে, হারাধনের ঐ ক্ষত-বিক্ষত জায়গায়, হাতে লতা পাতার বিরাত প্লাস্টার। কিশোরটিরও ঘাড়, মাথা, পেট, পিঠ- একই ভাবে আবৃত। আর মহাদেবেরও নিজের ঘাড়, মাথা, পিঠ- সব প্লাস্টারে মোরা। মহাদেব আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে ওঠে, “আহ-আহ আর পারছি না, আমার গোটা শরীর আহ- পারছি না।” সাথে সাথে এক সুদর্শন যুবক দৌড়ে আসে, ও মহাদেবের হাতে একটা ইঞ্জেকশন দেয়। আবার কয়েক মিনিট পর অন্য হাতে আবার একটা ইঞ্জেকশন দেয়।

কিছুক্ষনের মধ্যে মহাদেব অনুভব করে, তার ক্ষতের ব্যথাটা কমে যায়। মহাদেব এবার মশালের আলোয় যুবকটির মুখটা দেখতে চেষ্টা করে। সাথে সাথে যুবকটি মুখে কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয় ও চট পট করে, একে একে হারাধন ও সেই

খর্বকায় অসহায় কিশোরটিকেও একই ভাবে ইঞ্জেকশন দেয়। হারাধন মহাদেবের মনের ভিতরটা বুঝতে পারে, বুঝতে পারে তার বাবুর মনের ভিতরের বিভিন্ন প্রশ্নের আনাগোনা। হারাধন একটু এগিয়ে এসে মহাদেবের কানে কানে বলে, “বাবু, আর ভয় নাই। ঐ যে ছেলেটোকে দেখলেন, যে আমাদের তিন জনারে ইঞ্জেকশন দি গেলো, উ কেউ নয়, আমাদের হস্পিতালের ডাক্তারবাবু। এখানে কিছু বুলবেন না, উনি পরিচয় গোপন করে আছেন।” মহাদেব চুপ করে শুয়ে শুয়ে সব দেখতে থাকে।

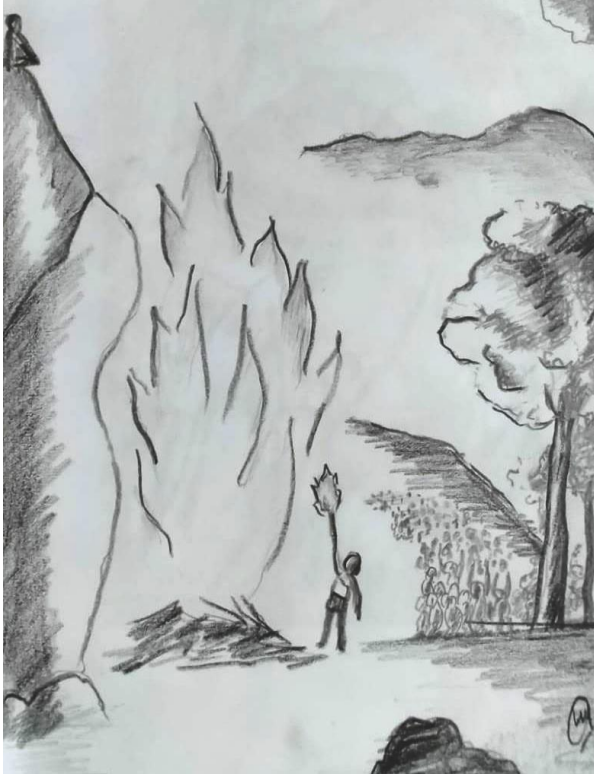
দেখতে পায়। পুরোহিতকে এবার দেখা যায়, কিন্তু আগুনের ঝঙ্কানিতে পরিষ্কার নয়। কে সেই পুরোহিত? জানার বড় কৌতূহল হল। একটু উঠে দেখার চেষ্টা করল। হারাধন চট করে উঠে মহাবেদকে আটকায় ও মুখে আগুল দিয়ে ইসারা করে চুপ করে বসতে বলে। ঐ আগুনের লেলিহান শিখা, তার ঝলকানি ও ঘন ঘন পুরোহিতের অদ্ভুত মন্ত্রচারনে অন্ধকার জঙ্গলটা যেন এক মায়াবি তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আর এই অগুপ্তি ভক্তকুল, সমগ্র এই আদিম নরনারীগণ তার সাক্ষী স্বরূপ। সবাই যেন একই ছাঁচের তৈরি। আগুন আর মশালের আলোর খেলাতে, এই আলো-আঁধারিতে, কাউকে আলাদাভাবে চেনা যায়না।

অনেক্ষন পর, মহাদেব হঠাৎ আবিষ্কার করে যজ্ঞের অগ্নিকুন্ডের পাশেই, দূরে সামনে ওটা কি যেন! কেমন যেন বিশাল উঁচু টিলা- নাকি বিশাল পাথর! মহাদেবের প্রাণটা ছট ফট করতে লাগল ওটা দেখার জন্য, কিন্তু না, সবার সামনে সে নিয়ম ভাঙ্গবে না, মহাদেব মনস্তির করল, পূজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে চুপ করে বসে থাকবে।

তবে, তার চোখ এক দৃষ্টে ঐ দিকেই কিছু খুঁজছে- চেনা অথচ অচেনা জিনিসটা তাকে জানতেই হবে। চেনা লাগছে, হ্যাঁ এটাই তো, এটাই তো দেখেছিল স্বপ্নে, হ্যাঁ স্বপ্নে!

প্রায় তিরিশ চল্লিশ ফুট উঁচু সেই পাথরের চাঁই। উপরটা কিছুতেই দেখা যায় না- নিচে এত আলো উপরটা অন্ধকার কেন! কোনওরকমে উঠে হারাধনের কানে কানে জিজ্ঞাসা করে, “ওটা কি? উপরে কি আছে? এটা কোথায়? আমরা এখন কোথায়? হাবল কই? সেনাই কই?”





### বনদেবতার যজ্ঞ

হারাধন বলে, “বাবু পূজোর সময় কথা কয়েন না, সব পরে বলব।” তারপর নিজেই বলে, “আপনি দেবতার দূত। এখানে কেউ আসার সুযোগ পাইনা। আপনি প্রথম পেলেন, আপনি ভগবান। বলেই কেঁদে ওঠে।” মহাদেব আবার উত্তেজিত হয়ে ফিস ফিস করে তিজ্জেস করে, “আরে, হাবল, সেনাই ওরা কই?” হারাধন বলে, “সবাই ইখানেই আছে, কটেজে আলো লাগিয়ে হাবল দৌড়ে চলে আসে আপনাকে দেখতে। ও খুব ভালো ছেলে। আপনি না থাকলে আজ আমাদের ঐ ছেলেটো, হয়ত বাঘের মুখ থেকে বেঁচে ফিরত না। সবাই আপনাকে তাই বনদেবতার দূত মেনেছে। সবাই খুব খুশি।”

ধীরে ধীরে যজ্ঞ শেষ হয়। সবাই উঠে দাঁড়ায়। এবার ঘুতাহুতি দেওয়ার পালা। মহাদেব ধীরে ধীরে যজ্ঞের মাঝে পুরোহিতকে খোঁজার চেষ্টা করে। হারাধন বাবুর মনের বাসনাটা হয়তো বুঝেছিল। তাই আগে থেকেই বাকি সবাইকে সরিয়ে সামনে যাবার রাস্তা করে দেয়। অদ্ভুত ভাবে সকল নরনারীগণ মাথা নত করে সরে সরে দাঁড়ায়। মহাদেব যত দেখে তত যেন অবাক হয়ে যায়। যজ্ঞ স্থলের

সামনে যখন হারাধন ও মহাদেব পৌঁছায় সবাই মহাদেবকে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করে। পিছন হয়ে সামনের মানুষটা, যে যজ্ঞ-স্থলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল হঠাৎ মাথার উপর হাত তোলে। সাথে সাথে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত নরনারীরা চূপ করে সরে সরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। হারাধনও পিছনে সরে দাঁড়ায়। মহাদেব পিছনে তাকাতে যায় হঠাৎ সামনের মানুষটা মহাদেবের দিকে ঘুরে দাঁড়াই ও একটা মশাল মহাদেবের দিকে এগিয়ে দেয়। মহাদেব স্তম্ভিত! একি- একি- এই তো সেই বেঁটে খাটো সেই বুড়ো মানুষটা যে সেই রাতে মহাদেব কে স্বপ্নে দেখা দেয়। মুখে তার হাসি হাসি। অথচ কি কঠিন মুখ। শক্ত চোয়াল।

গোটা শরীর এখনো যেন পাথরের মত শক্ত। চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বলছে। যেন কত জন্মের কত অব্যাক্ত অত্যাচারের দাবানল জ্বলছে তার চোখ দুটিতে।

মহাদেব ধীরে ধীরে তার হাত থেকে মশালটা নেয়। এবার পুরোহিতটা মহাদেবকে এগিয়ে আসতে ঈশারা করে। মহাদেব এগিয়ে যায়। তারপর পুরোহিত পাশে থাকা একজনকে কী যেন একটা ঈশারা করে চায়। আলো আঁধারিতে মুখটা যেন একটু চেনা লাগলো মহাদেবের। আরো ভাল করে দেখে মহাদেব। মুখটা খুব চেনা কিন্তু কিছুতেই যেন চিনতে পারে না। মহাদেবের মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। আরো কাছে যেতে যায় মহাদেব তাঁকে চেনার জন্য। কিন্তু বুড়োটা মহাদেবের হাতটা চপ করে ধরে। আর মহাদেব এগোয় না। নিজেকে সংযত করে নেয়। কিন্তু কি সাংঘাতিক হাতের জোড় পুরোহিতের। যে কোন যুবক হার মানতে বাধ্য। এবার ঘি এর দুটো পাত্র একটা পুরোহিত ও একটা মহাদেব হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। পুরোহিতের নির্দেশ মতো মহাদেব যজ্ঞে ঘটাহুতি দেয়। আবার দাউ দাউ করে আগুন উপরের দিকে উঠতে থাকে। তারপর পুরোহিত, এক বিরাট বাঁশের সাজি মহাদেবের দিকে এগিয়ে দেয়। পুরোহিতের নির্দেশে ফুল, বেলপাতা, ফল সব একে একে মহাদেব যজ্ঞে আহুতি দেয়। তারপর পুরোহিতও বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করে, একই ভাবে যজ্ঞে আহুতি দেয়।

মূহুর্তের মধ্যে চারদিকে যেন এক দমকা হওয়া বয়ে গেল। চোখে ধুলো ঢুকে যায় মহাদেবের। আবার চোখ খুললে মহাদেব দেখে চারদিকে যেন বিদ্যুৎ এর ঝলকানি। আগুনের শিখাও চল্লিশ ফুট পাথর পেরিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ মহাদেবের চোখ যায়, উঁচু পাথরটার উপর। যেন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট উপরটা দেখে সেই পুরোহিতটা।

মানে! মহাদেব ঝট করে পাশে তাকায়- দেখে এখানেও সেই পুরোহিত উপরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি যেন বলছে। উপরে যে পুরোহিতটা বসে আছে, তার গায়ে সেই অদ্ভুত আলপনা আঁকা, সব কিছু স্বপ্নের সাথে মিলে যায়। কিন্তু পাশে যে আছে তার গায়ে আলপনা নেই। শুধু মাথায় তিলক। তিবে কি উনি আলাদা জন?

মনের দ্বন্দ্ব কাটতে চাইনা মহাদেবের। আশে পাশে, হারাধন, সেনাই, কেউ নেই, সবই তো ওই মানুষের ভিড়ে। মহাদেব আর কোনও প্রশ্ন করে না, বুঝতে পারে না- বনদেবতার ইন্দ্রজাল; ধপ করে বসে পুরোহিতের পাদুটিকে হাত দিয়ে ধরে। জিজ্ঞাসা করে ওঠে, “কে আপনি- বলুন কে আপনি- বলুন- কে আপনি? এ সব কি দেখছি আমি! পাথরের উপরে উনি কে? বলুন- বলতেই হবে।” বলে কেঁদে ফেলে। পুরোহিত এবার মহাদেবের দুই হাত ধরে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে। পুরোহিতেরও চোখদুটি ছল ছল করে ওঠে। পুরোহিত হঠাৎ স্পষ্ট বাংলায় বলে ওঠে। “ওঠো পুত্র। তুমি দেবতার দূত-” আবারও বলতে থাকে, “- আমি সামান্য মানুষ মাত্র। ওই উঁচু শিলার উপরে যাঁকে দেখছ, তিনিই আমাদের দেবতা, বনদেবতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সকল দেবতার শক্তির আধার উনি।” মহাদেব চমকে উঠে বলে, “আপনি বাংলা....”, পুরোহিত মহাদেবকে থামিয়ে তার মনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে, “হ্যাঁ আমি ছাড়াও এ অঞ্চলে কয়েকজন বাংলায় কথা বলে। আমরা শূনে শূনে শিখেছি। তুমি ভাবছ তাহলে রাতে স্বপ্নে তোমার প্রশ্নের উত্তর উনি কেন দেননি। আসলে উনি দেবতা, উনি ব্রহ্ম লোকে বিরাজ করেন, উনি কি করে তোমার কথার উত্তর দেবেন? তবে এই জঙ্গলের প্রতিটি কোনায় কোনায়, জঙ্গলের লতায় পাতায় প্রতিটা জীবের মধ্যে এমনি ধূলা, বালি, জল, স্থল, অন্তরীক্ষে সব যায়গায় বিরাজ করেন। তুমি শিক্ষিত ছলে তুমিতো সবই জানো। ভগবানের কোনও আকার হয় না। তিনি নিরাকার। মানুষ যে রূপে তার সাধনা করেন, সেই রূপেই তিনি দেখা দেন।” শ্রদ্ধায় ভক্তিতে নতজানু হয়ে মহাদেব আবার বসে পরে। উঁচু পাথরটার দিকে এক পলকে চেয়ে থাকে। পুরোহিত বলে ওঠে, “যাও হে অমৃতের সন্তান তুমি তোমার প্রভুকে প্রণাম জানিয়ে এসো।” পুরোহিত গলা আরো উঁচুতে উঠিয়ে বলেন, “এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও উনি তোমার প্রণামের অপেক্ষায় বসে আছেন।”

মহাদেব এক অভ্যন্তরীণ ঈশারা য় এগিয়ে যায় পাথরটির দিকে। গোটা শরীর ত্রিভুবন যেন কাঁপছে, মহাদেব, জড়িয়ে ধরে সেই প্রস্তুত থওটিকে। মুহূর্তে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয় চারিদিক। কে বলে এটা জঙ্গল? এতো মন্দির, দেবালয়,

মানবজাতির তীর্থ স্থান। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তীব্র বজ্রপাত, ঠিক যেন পাথরটার উপর এসে পরে। মহাদেবের শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন সেই দৈবিক অলোক রশ্মী মাথা থেকে পা দিয়ে নেমে যায়। তারপরেই মুশল ধারে বৃষ্টি। ধীরে ধীরে যজ্ঞের সমাপ্তি হয়। মহাদেবের হয় নব-অভ্যুদয়। সবাই নতজানু হয়ে জোড় হাত করে বন দেবতাকে প্রণাম জানায়। কিছুক্ষণ পরে ঝড় বৃষ্টি থামে। ভোরের আলো তখন হাল্কা করে চারদিকে দেখা যায়। মহাদেব পাথরটির চূড়ায় আবার দেখে। দেখে সেখানে আর কিছু নেই। পুরোহিত মহাদেবের মনের ভাষা বুঝতে পারে। বলে, “আজ থেকে তুমি বন দেবতার কাছে দীক্ষিত। বন দেবতাকে আমরা রাতেই দেখি, দিনে নয়। দেখছ না চারদিকে আলোর আনাগোনা শুরু হয়েছে। তাই তিনি আজকের মত বিদায় নিয়েছেন। আবার সন্ধ্যার পরেই চলে আসবেন।”

এবার প্রভাতের আলোকে চারদিকটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নব অরুনের স্নিগ্ধ শীতল রশ্মী ধীরে ধীরে গহন অরণ্যের অন্যতম দৈব পীঠস্থানকে আলোয় ভরিয়ে তোলে।

হাল্কা শীতল মলয়ের দোলায়  
বন্য সুগন্ধি কুসুমের শোভায়  
মন হারানো সবুজের মায়ায়  
অপরূপ স্বর্গীয়, ধর্মীয় আউনায়,

-আজ মহাদেব পায় নতুন জীবন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এখনও সেখানে চলে জীবনের কলতান। স্তম্ভিত, বাকবুদ্ধ হয়ে মহাদেব চারিদিকের সবুজ শোভায় আপন দৃষ্টিকে দেয় অমৃতের সম্ভার। কত যুগ পর, বোধকরি এই মায়া জগতের হাতছানিতে আজ মহাদেবের এখানে হয়েছে উদয়। সাথে সাথে মহাদেবের চোখ পরে মাটির দিকে। সাদা সাদা এগুলি কি? নিচু হয়ে দেখে সেই সাদা ফুল, গোটা এলাকাটা ফুলের যেন গালিচা হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে সমস্ত নরনারীগণ শিলাখন্ডকে মূর্তো মূর্তো সাদা ফুল দিয়ে প্রণাম জানিয়ে আপন আপন কাজে চলে যেতে থাকে।

## ৪। মহাদেব প্রধানের প্রধান অতিথি

পুরোহিত মহাদেবের কাঁধে হাত রেখে বলে, চল আজ আমাদের ঘরে চল। তুমি আজ আমাদের আপনজন। মহাদেব হঠাৎ চেতনা ফিরে পেয়ে বলে, “-কিন্তু হারাধন, সেনাই, হাবল, তারা কোথায়? ওরা ছাড়া আমি একা কি করে যাব?” পুরোহিত হাত ঈশারা করে দেখায়। অনেক দূরে তিনজন বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। পুরোহিত হাত ঈশারা করে তাদের ডেকে নেয়। তিনজন প্রায় ছুটে এসে প্রথমে শিলাখণ্ডকে ফুল দিয়ে প্রণাম করে। একমুখ তৃপ্তির হাসি নিয়ে মহাদেবের সামনে জোড় হাতে দাঁড়ায়। মহাদেবও আনন্দ ধরে রাখতে পারেনা। আনন্দে চোখে জল চলে আসে। তারপর বলে, “আচ্ছা, সেই বাঘটার কি হল? আর, ওই বাঘাটাই বা কেমন আছে?” পুরোহিত অভয় দিয়ে বলে, “সবাই ভালো আছে। ছেলেটির বাবা ওকে বাড়ি নিয়ে গেছে। ওর বাবা তোমার সাথে দেখা করতে আসবে একটু পরেই।” “আর ওই বাঘটা-”, মহাদেব জিজ্ঞাসা করে।

পুরোহিত বলে, “জঙ্গলের নিয়ম অনুযায়ী কোনও বন্যপ্রাণী আমরা হত্যা করি না। যদি না সেটা আমাদের পেটের খাবার হয়। তাতে বনদেবতা রেগে যাবেন। আমরা সবাই একসাথে থাকি। ইদানীং জঙ্গলে চোরা শিকারীদের জন্য হরিণ, ছাগল ও অন্যান্য জীবজন্তু- বাঘেদের খাবার, কমে এসেছে, তাই এই ধরনের হামলা। আগে বাঘ- সিংহ, আমাদের- মানে মানুষের উপর হামলা করত না। কিন্তু খিদের স্বালায় ওরাও আজকে, অনেক বেশি হিংস্র হয়ে উঠেছে। তবে বাঘটিকে এলাকার লোকেরা, ঝর্না পার করে পাশের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। ওই দিকটাই বাইসন, হরিণ আরো অনেক ধরনের বন্য প্রাণী আছে। তাই ওই বাঘটির আর এদিকে আসার সম্ভাবনা কম। তাই আপাতত ভয়ের কোনও কারণ নেই।”

মহাদেব অবাক! এত মায়া, এতো শৃঙ্খলা এদের! মহাদেব বলে, “আজ সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে।”

মহাদেবের কাঁধে, হাতে, পায়ে, পিঠে বাঘের আঁচরের ব্যাথা এখনো রয়েছে। কিন্তু প্রাণে যে বেঁচে ফিরেছে, বার বার চিন্তা করেও অবাক হয়ে যায়। মহাদেব জানেও না ওর শরীরে কোথায় কোথায় ক্ষত। কারণ সারা শরীরে তো লতা পাতার ব্যান্ডেজ। হারাধন বলে, “বাবু আপনার পুরো শরীর রক্তে ভেসে যাইছিল। তবে স্বয়ং বনদেবতা আপনাকে স্বপ্নে দেখা দেন। আপনার কি কোনো ক্ষতি

হয়! উ হবে না।” পুরোহিত সম্মতি জানিয়ে বলে, “একদম ঠিক হারু। স্বয়ং ঠাকুর যার সহায় আর শ্রী ঠাকুরকে যে বুক ধরে বিশ্বাস করে তাকে বাঘ কেন, ত্রিভুবনের কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারে না।” আবার, মহাদেব জিজ্ঞেস করে, “আরে আজকের অফিস! কেউ তো কিছু জানে না! কাজগুলোই বা কী করে হবে?” মহাদেবকে খামিয়ে দিয়ে পুরোহিত বলে, “তোমার কোনও ক্ষতি হোক আমরা চাই না। তাই কাল রাতেই সেনাই ও ওই বাঘাটির বাবার হাত দিয়ে অফিসের লেটার বক্সে আমরা খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।” “কিন্তু কে চিঠি লিখলো, মানে এখানে পড়াশুনা জানে কে সে?” মহাদেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে। পুরোহিত বলে, “গ্রামের প্রধান হিসেবে এইটুকু দুই-এক কলম লেখা আমার অভ্যাস আছে।” আবার চমকে ওঠে মহাদেব, “আপনি প্রধান মানে এই জঙ্গলের এই গ্রামের?”

এবার প্রধান (ওরফে পুরোহিত) মহাদেব কে খামিয়ে বলে, “হ্যাঁ। আমিই এখানকার প্রধান। বাকি কথা পরে হবে। চল এবার ঘরে চলো। বিশ্রাম নেবে। দুদিন পর ছেড়ে দেব। ততক্ষণে তোমার সেবা দেওয়া আমার, আমাদের সকলের কর্তব্য।” মহাদেব যেন হঠাৎ করে বন্দি। ভাবে কি করে তাহলে অফিস চলবে। একদিন মাত্র অফিস গেছে। নিতাই এর মত লোকজন অফিসে ভর্তি। অফিস না গেলে কি করে হবে!

এসব ভাবতে ভাবতেই বড় বড় বৃক্ষরাজের পদতল দিয়ে চার পাঁচজন মানুষ এগিয়ে চলেছে। সূর্যের তাপও এবার অনেক চরা। তবুও জঙ্গলের সব জায়গাতে ঢুকছে না। নানা রকম পাখির আওয়াজ, ময়ূরের ডাক ও হনুমানের এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফালাফি দেখতে দেখতে তারা অবশেষে পৌছাল, পাথরে ঘেরা তালপাতা ও বাঁশের কাঠামোয় তৈরি প্রধানের বাড়ির কাছে। শক্ত পোক্ত বেশ কয়েকটি ঘর পাশাপাশি একসাথে হাতে হাত ধরাধরি করে যেন দাঁড়িয়ে আছে—যেন সমস্ত রকম বিপদে একে অপরের সাথে এক নাড়ীতে যুক্ত।

প্রধানের ঘরের বাইরেরটা যতই শক্ত হোক, ভিতরটা একেবারে গুদাম ঘরের মতো। ঘরের অর্ধেকটা মাটির নীচে, অর্ধেকটা মাটির উপরে। যেটুকু জায়গা মাটির উপরে সেখানে চারদিকে চারটি ঘুল ঘুলীর মতো জানলা। ঘরে অস্ত্রিজেন ঢোকার এইটুকুই রাস্তা। কিন্তু পুরো ঘর একদম ঠান্ডা। আজকের দিনে বাঘা বাঘা সিঁভিল ইঞ্জিনিয়ার গাছ লাগিয়ে কত কসরত করে কত রকম ভাবে পরিবেশ বান্ধব ঘর বানায়। তাঁরা যদি এই ঘর গুলি দেখত তাহলে তাঁরা বুম্বত পরিবেশ বান্ধব

ঘর করতে মোটা মোটা বই না পড়লেও চলে। সাধারণ জ্ঞানটাই অনেক বেশি বড়। এখানে যতগুলি ঘর সব গুলি প্রায় একই প্রকার।

ঘরের মধ্যে দুটো পাঁচ ফুট করে লম্বা তাক। প্রত্যেকটাতে দুজন মানুষ আরামে শুতে পারবে। কেবল তাক দুটি একটি আর একটির উপরে প্রায় দুই ফুট উঁচুতে। অন্যদিকটায় বিভিন্ন মাটির হাঁড়ি খাবার জিনিষ ও জলের পাত্র। শুধু রান্নার উনুন গুলো ঘরের বাইরে। আর শোয়ার তাকের নিচে আছে বিভিন্ন রকম ধারালো অস্ত্র। আর আছে ডজন খানেক কাপড়ের তৈরি মশাল।

প্রধানের ডাকে মহাদেব ঘরের বাইরে আসে ও সবার সাথে প্রধান আলাপ করিয়ে দেয়। সে, ভাষা অবশ্য মহাদেব বিন্দু বিসর্গও বোঝে না। শুধু মাথা নাড়ে। তারপর মহাদেব সামনে দেখে বিশাল একটা লম্বা ঘর। মহাদেব জিজ্ঞাসা করে, “ওটা কি?” প্রধান বলে, “এস দেখেই যাও।” মহাদেব পিছু পিছু যায় ও ঘরের ভিতরে ঢোকে।

দুকেতেই, বিকট ঝাঁঝালো গোবর আর মূত্রের গন্ধে প্রায় বমি চলে আসে মহাদেবের। কোনোরকমে নিজেকে সামলে দেখে, প্রায় ৭০-৮০ফুট লম্বা গরু ও মোষের গোয়াল ঘর। সারি দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে। তারই একটা কোণে হাঁস ও মুরগীর এক মস্ত খাঁচা। আবার তাদের পাশেই আছে হাঁস মুরগীর বাচ্চার জন্য আলাদা বড় একটা খাঁচা। তবে সমস্ত মল মূত্র ঘরের বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য রয়েছে মোটা মোটা অনেক গুলি নালী, যে গুলো মাটির নীচ দিক দিয়ে গিয়ে জলাশয়ে মিশছে। কি জানি এসব প্রযুক্তি এদের কে শিখিয়েছে! মনে মনে ভাবে মহাদেব, তবে বেশিক্ষণ থাকতে না পেরে বেরিয়ে চলে এসে লম্বা শ্বাস নেয়।

বাইরে থেকে কারও ক্ষমতা নেই বোঝার যে এগুলি আদৌ কোনও ঘর। ঠিক যেন বর্ডারে সেনাদের ঘর। আদুল গায়ে কিছু কচি কাঁচা বাচ্চা নারকেলের মালা, তালের মালা এসব নিয়ে খেলায় মত্ত। কেউ কেউ ঘরে আবার ছাগল, ভেড়াও রেখেছে। কুটির শিল্প ও প্রযুক্তি শিল্প এখানে যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। মুগ্ধ হয়ে মহাদেব প্রধানের ঘরে এসে বসে। প্রধান বলে, “তুমি বসো। হারাধন, সেনাই ও হাবল একটু পরে চলে আসবে। আমি একটু গরু মোষ গুলোকে মাঠে ছেড়ে আসি।” বলে প্রধান বেড়িয়ে যায়। মহাদেব প্রশান্তি মনে কাঠের চৌকিতে একবার আরাম করে শুয়ে পড়ে।

একটুপর মহাদেবের তিন অনুচর এসে হাজির। সবার মুখে এক গাল হাসি ও আনন্দে আটখানা। যেন কতদিন পর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আপনজন এসেছে কুঁড়ে ঘরে। মহাদেব বাকবুদ্ধ হয়ে সব উপভোগ করতে থাকে। একটু পরে প্রধান, মহাদেবকে বাইরে ডাকে। মহাদেব বাইরে আসে। প্রধান এবার একগাল হেসে একজনকে দেখিয়ে বলে, “এই সেই ব্যক্তি, ঐ ছেলেটির বাবা, ওর খুব ইচ্ছা তোমাকে ও আজ নিজে রান্না করে খাওয়াবে। আর ওই দেখ ছেলেটিও বাবার কাঁধে চড়ে তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে।”

মহাদেব হঠাৎ চমকে ওঠে, এই লোকটি কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। কথায় যেন দেখেছে। সেই লম্বা বিশালদেহী লোকটি। বাপরে কি চেহারা যেন সাক্ষাৎ গরিলা। প্রায় সাত ফুট লম্বা, হাতের গড়ন যেন পায়ের উরুর থেকেও মোটা ও তেমনি পেশিবহুল। নিকশ কালো রং, নাক, চোখ, মুখ আলাদা করে বোঝা দায়, যদি আলো না পায়। প্রধান লোকটিকে কি একটি বলে। হঠাৎ লোকটি ও ছেলেটি হাঁটু মুড়ি দিয়ে বসে মহাদেবকে জোড় হাতে প্রণাম করে। মহাদেব লজ্জিত হয়ে বলে, “একি করছেন প্রধান বাবু, উঠতে বলুন একে। আমায় কেন প্রণাম করছেন।” প্রধান আবার কি একটা বলে লোকটাকে। লোকটি আবার উঠে দাঁড়ায়। মুখে এবার একগাল হাসি। ছেলেটি বাবার কাঁধে নিশ্চিন্তে মাথা পেতে নির্বাক হয়ে দেখে সব কিছু। মহাদেবও অবাক হয়ে দেখে ও মনে মনে ভাবে নিজে তো কোনও দিন পিতৃস্নেহের স্বাদ পাইনি, আজ কেন জানি পিতৃস্নেহের বাস্পস্পর্শ জেগে উঠেছে। মনে মনে শ্রী ঠাকুরকে স্মরণ করে সকলের মঙ্গল কামনা করে। মহাদেব ছেলেটিকে দেখে একটু হাসে, সাথে সাথে ছেলেটিও মুচকি হেসে মাথা ঘুরিয়ে নেয় পিছন দিকে।

প্রধান বলে মহাদেবকে, “চল ভিতরে বস, আরাম কর। ও আজ খান চারেক বন মুরগীর রান্না করবে। আজ সবাই একসাথে খাব। সবাই তোমার বিরত্নে আনন্দে ডগমগ। গোটা জঙ্গলে তোমার নাম ছড়িয়ে গেছে।” মহাদেব বলে, “আচ্ছা এখানে সবাই কে দেখেছি, ওই মেরে কেটে সাড়ে চার থেকে পাঁচ ফুট ওই লোকটি!” প্রধান একটু গম্ভীর হয়ে বলে, “ঠিক, একদম ঠিক- তোমার চোখ আছে বলতে হবে”, বলেই বেরিয়ে যায়। মহাদেবের যেন বিস্ময়ের অন্ত নেই।

অনেক্ষণ পর প্রধান ফিরে আসে। মহাদেবকে শান্ত ভাবে বলে, “কাল রাতে ডাক্তার তোমাকে দেখে গেছে, আমিও ছিলাম। আজকে আর আসবেনা। ওষুধ, ইঞ্জেকশন, সবই দিয়ে গেছে। তোমাদের তিনজনকে ও ঐ বাচ্চা ছেলেটিকেও দেখে গেছে। আজ সারাদিন বিশ্রাম ও হাল্কা খাওয়া দাওয়া করতে বলেছে। কাল পর্যন্ত তোমাদের দেহে যত ক্ষত, আশা করি অনেকটা কমে যাবে। এ আমার কথা নয়,



ডাক্তার নিজেই বলে গেছে। খুব ভালো ছেলেগো ডাক্তার, ঠিক তোমারই মত। যাই হোক, কাল সকালে আবার ডাক্তার এসে তোমাদের সকলকে দেখবে।” মহাদেব বলে, “কিন্তু আমাকে এখানে কেন নিয়ে এলেন?” প্রধান মহাদেবকে অভয় দিয়ে বলে, “এত চিন্তা কেন করছ?” তারপর হাসি মুখে বলে, “আমি আছি, তোমার তিন অঙ্ক ভক্ত আছে, কেন এরকম করছ? দেখ, ভগবানের অশেষ কৃপায় এই জীবন ফিরে পেয়েছ, এত উতলা হবেনা। আর ডাক্তার বার বার বলে গেছেন- দুদিনের আগে এখান থেকে বেড়ানোর চেষ্টা করো না। এখন বারো ঘন্টাও হয়নি তোমরা শুধু মাত্র ওষুধ আর ব্যাথা কমানোর কড়া ইঞ্জেকশন এর জন্য একটু শরীরে বল পেয়েছ। তার মানে এই নয় যে তোমরা এখন সুস্থ। তাই যতটা পার এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নাও। কারণ হারাধন, সেনাই তারাও এখন পুরোপুরি সুস্থ নয় যে তোমাকে কটেজে গিয়ে রেখে আসব।” লঙ্কায় লাল হয়ে যায় মহাদেব ও ধীরে ধীরে প্রধানের ঘরে মহাদেব আশ্রয় নেয়। হারাধন একটু জল এনে দেয়, যেন বুঝেছিল বাবুর কষ্টটা। মহাদেব নিচু মাথাতেই মাটির পাত্রে আকর্ষিত জল পান করে। ও ধীরে ধীরে শুয়ে পরে। শুধু চোখের পলক পড়েনা বিশ্বর চিন্তায়।

কিছুক্ষণ এই ভাবে শান্ত হয়ে মহাদেব শুয়ে ছিল।

একটু পরে হারাধন ও সেনাই ধীরে ধীরে এসে খবর দেয় ও বলে, “বাবু খাবার হয়ে গেছে, চলুন খাবেন।” মহাদেব যেন ক্লান্ত পশ্বিক। অলস ভাবে উঠে বলে, “চল আসছি, আচ্ছা হারু, সেনাই তোমরা কেমন আছ- মানে ব্যাথা কমেছে- একটু সাবধানে থেকো।” শূনে সেনাই, খিল খিল করে হেসে ওঠে, বলে, “উ কথা ছারুন দেখি- আমরা সবাই ভালো আছি- এই হারু বলনা।” হারাধন সম্মতি দিয়ে বলে, “হ্যাঁ বাবু আর কুনো ব্যাথা নাই, কুনো ভয় নাই।” হারাধন জিজ্ঞাসা করে, “বাবু এখানে আপনার ভালো লাগছে তো? আপনি ভাল বিছানাতে শুয়ে অভ্যস্ত। আমাদের এখানে তো সে সব নাই।” কথাটা মহাদেবকে গিয়ে যেন তীক্ষ্ণ ভাবে বিঁধল, “না-রে-না, তা নয়, আমার সব কিছু কি রকম গওগোল লেগে যাচ্ছে-” হাঁপাতে থাকে মহাদেব। তারপর সামলে নিয়ে বলে, “-চল, থিদেও পেয়েছে।”

দেরি না করে মহাদেব তিন অনুচরকে সাথে নিয়ে একটা বড় গাছের তলায় এসে হাজির হয়। অনেক দূর ফাঁকা জায়গা একটা। সামনে স্থানীয় নরনারীরা ব্যস্ত খাবারের আয়োজনে। দূরে অনেক দূরে গরু মোষ গুলি চড়ে বেড়াচ্ছে। প্রধান এগিয়ে এসে বলে, “এসো এসো সাবধানে এসো, বলে একটা বড় সমান পাথরের উপর বসতে বলে। মহাদেব হাত মুখ জল নিয়ে ধুয়ে, আরাম করে

বসে।” একে একে সবাই সারি দিয়ে খেতে বসে যায়। কেউ মাটিতে, কেউ পাথরে, হাতে সবার কলা পাতার থালা। মহাদেব ভাবে তাহলে খাবরটা দেবে কে?

দেখে মাটির উনুনের উপর বিশাল একটা কালো কড়াই। পাশের আরেকটা উনুনে বড় গামলা। এক বুড়ি গামলা থেকে গরম ভাত ও কড়াই থেকে মাংসের ঝোল তুলে দিচ্ছে আর আর ঐ বিশালদেহী লোকটা আগে মহাদেবকে তারপর প্রধানকে, একে একে সবাইকে পরিবেশন করে দেয়। যেন কতদিন খায়নি এমনভাবে মহাদেব, গরম ভাত মুখে তোলে। মাংসের ঝোল আর ভাত এত সুস্বাদু হতে পারে তাও কোনও মশলা ছাড়া, যেন ভাবা যায় না। মহাদেবের প্রায় চেটে পুটে খাওয়া শেষ। পাশ থেকে হঠাৎ সেই বুড়িটা এসে বাংলায় জিজ্ঞাসা করে, “আর নেবে বাবা? আরেকটু ভাত মাংস দিই।” মহাদেব চমকে উঠে বলে, “না না, আর পারব না, পেট ভরে গেছে।”

বুড়িটা মাটির পাত্রে জল এগিয়ে দেয়। মহাদেব জিজ্ঞাসা করে, “আপনি এখানে? আপনি এখানে থাকেন?” বুড়িটা জলটা রেখে দিয়ে চলে যায়। মহাদেব জলটা এক ঢোক করে খায় ও একটু করে যেন নিজের মগজটা চাঙ্গা হয়। খাবার পর অনেঞ্জন মহাদেব ঠান্ডা হাওয়ায় বসে আছে ও চিন্তার সূত্র গুলো মেলানোর চেষ্টা করে চলেছে। সব মিলছে, তবু এক জায়গায় মিলছেনা।

## ৫। প্রধানের আসল পরিচয়

সে দিন রাত্রে প্রধানের ঘরে দুজন- একটা চৌকিতে মহাদেব আরেকটাতে প্রধান। মহাদেবের তিন অনুচরেরা পাশের লাগোয়া ঘরগুলিতে সব শূতে যায়। যাবার আগে মহাদেব ও প্রধানকে প্রণাম জানিয়ে যায়।

প্রধান এবার ঘরের দরজাটা লাগিয়ে দেয়, তারপর মাটির একটা ছোট প্রদীপ ঘরে জ্বালিয়ে দেয়।

মহাদেব আবার হয়ে বলে, “শোবেন না, এখন প্রদীপ জ্বালানেন!” প্রধান বলে, “অনেকদিন পরে একটু গল্প করার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। যেন প্রধানের গলাটা একটু ধরা ধরা।”

প্রধান শুরু করে, “তুমি যখন এই কটেজে এসেছ, তখন থেকেই তোমায় আমি চিনি। হ্যাঁ, খবরটা দেয় আমারই বোন, যে তোমাকে অফিসে বরণ ডালা নিয়ে বরণ করেছিল। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, আজ ওকে দেখে চিনেও ফেলেছ। এ জঙ্গলে কেউই আমার ও আমার বোনের আসল কথা জানে না। সবাই জানে আমরা এখানকারই।”

মহাদেবের হৃদস্পন্দন যেন বেড়ে যাচ্ছে, যত শুনছে। প্রধান আবার শুরু করে - “আমার জন্ম এখানে নয়। আমি জন্ম সূত্রে উত্তর পূর্ব ভারতের। ছোটবেলা কেটেছে সেখানেই। এবং অবশ্যই, আমার বোনের ছোটবেলাও সেখানেই কেটেছে। সবুজে ঘেরা, পাহারি ছোট গ্রাম, কত হাজার রকমের বাহারি ফুল, লতা পাতা, গাছ গাছালি, কত স্বপ্ন- বড় আবছা আবছা মনে পড়ে।”

বলেই প্রধান মাথা নিচু করে থেমে যায়, গলা ধরে আসে। মহাদেব বুঝতে পারে বৃদ্ধের কষ্টটা। ভীষণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা, আপনি তার মানে - এখানে- মানে এই জঙ্গলে প্রধান কি করে? - একটু খুলে বলবেন। দয়া করে কিছু লুকবেন না। দেখুন আমি আপনাকে জোর করতে তো পারি না। আপনি সত্যি একজন স□ মানুষ, কিন্তু আমি একজন অফিসার হিসাবে যদি জানতে চাই, আপনার আসল পরিচয়, নিশ্চয় আপনার কোন আপত্তি নেই।” প্রধান এক পলক সন্দ্বিহান চোখে মহাদেবের দিকে তাকায়। জিজ্ঞাসা করে, “মানে?”

মহাদেব কিছুটা সংকোচ বোধ করছিল, কিন্তু এবার আরো স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করে, “একজন অফিসার হিসাবে এই জঙ্গলের সমস্ত কিছু জানার আধিকার আমার আছে। এটা নিশ্চয় আপনি জানবেন। আর সেই জন্যই আপনার আসল পরিচয় আমি জানতে চাইছি।”

প্রধান ক্র কুণ্ঠিত করে জিজ্ঞাসা করে, “যদি না বলি-”।

মহাদেব এবার একটু বিরক্ত; বলে, “-কেন? তবে আমাকে এখানে কেন এনে রেখেছেন- অহেতুক কেন আমাকে এখানে আনলেন- এটা কি কোনো মানসিক অত্যাচার নয়?” প্রধান এবার একটু হাসে, বলে “তুমি রাগ করছ অফিসার, আমি তোমাকে এমন মজা করছিলাম। আমি তোমাকে সব বলব বলেই বসেছি। শুধু একটা অনুরোধ-”, মহাদেব এবার একটু লজ্জা পেয়ে যায়, বলে, “একি অনুরোধ করছেন কেন? আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন আমি কাউকে বলব না।”

বৃদ্ধ প্রধান মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়, তারপর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলে, “জানতাম, আমি জানতাম, ওটুকুই ভরসা ও বিশ্বাস, আমি তোমার কাছে চেয়েছি। কারণ তোমার উপর এই জঙ্গলের সকলের ভালোবাসা জড়িয়ে আছে, সকলেই তোমার বীরত্বে খুশি। কিন্তু ভুল করেও যদি আমার আসল পরিচয়- এই আদিবাসীদের কেউ জেনে ফেলে, সব বিশ্বাস ভেঙ্গে যাবে- সব কিছু নিয়ম, আমার এত পরিশ্রম, সব শেষ হয়ে যাবে।”

মহাদেব আশ্বাস দিয়ে বলে, “আপনি কোনও ভয়ই করবেন না, বললাম তো আপনার আমার মধ্যে, এখানে যা কথা হবে, কেউ জানবে না।”

বৃদ্ধ আবার শুরু করে, “সাল তারিখ অত মনে নেই। শুধু মনে পড়ে তখন দেশ জুড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে। বন্দুক - আগুন - গোলা - বারুদ, চারদিকে শুধু বারুদের গন্ধ। স্বাধীনতার জন্য একে একে বীর যোদ্ধারা শুধু দেশটার জন্য লড়ে যাচ্ছে। থাওয়া নেই - ঘর নেই - কি যুদ্ধ - উরুফ-”, বলে বৃদ্ধ কাঁপতে থাকে। আবার বলে, “ওই সময় গোটা দেশ নয় পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ চলছে। আল্ফ্রিয়ারদের মুখেই শোনা, আমার জন্ম তখনই, তার এক বছর পর আমার বোন এই পৃথিবীতে আসে।” বৃদ্ধ একটু থেমে ঢোক গলে।

মহাদেব স্তব্ধ হয়ে শুনছে এক অসম জীবনের কাহিনী। যেখানে আর্থ অনার্থ কোনও বাধা মানে না, শুধু থেমে থাকে কিছুটা সময়, আর বাড়তে থাকে হৃদয়স্পন্দন।

বৃদ্ধ বলে চলে, “আমরা চালার ঘরে থেকে কোনও খবর পেতাম না। শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ চারিদিকে, ভয়ে ঘরেই থাকতাম। তারপর, হঠাৎ একদিন সকালে দেখি কোনও গোলা গুলির শব্দ নেই, সবাই আনন্দে ছোটোছুটি করছে, সেদিন যে কি আনন্দ সবার চোখে মুখে বোঝাতে পারব না। বুঝলাম দেশ স্বাধীন হয়েছে। সেদিন, পাড়ার ক্লাবের দাদা দিদিরা আরো সব বড় বড় লোকেরা জাতীয় পতাকা বুকে জড়িয়ে কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে।”

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে হাসে, আবার উপর দিকে তাকায়। আবার বলে, “মা বাবাকেই – জ্ঞান হবার পর থেকে – আর দেখিনি।”

ফ্রান্সের জন্য বৃদ্ধ আবার থামে। তারপর আবার বলে, “ওই পাড়ার দাদা, দিদি, মাসিমা, সিসিমাদের মুখে শোনা, পুলিশ নাকি বাবা মা দুজনকেই ধরে নিয়ে গেছিল। অবশ্য পুলিশ আসছে শুনেই পাড়ার এক দাদা রাত্রেই তাদের বাড়িতে আমাকে আর বোনকে নিয়ে চলে যায়।”

হঠাৎ করে মহাদেবের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে, ভেসে আসে কিছু বিচ্ছিন্ন স্মৃতি কিছু ঘটনা। কোথায় যেন নিজের জীবনের ছোটবেলাটা মনে পরে যায়। আর্থ ও অনার্থ দুটি জীবনের, সম্পূর্ণ আলাদা জীবন ধারা, কোথায় যেন এক স্রোতে মিশে গেছে। এতক্ষণ বাকবুদ্ধ হয়ে মহাদেব সব শুনছিল। এবার মহাদেব জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা, আপনার মা বাবা তাঁরা ওই দাদার বাড়িতে যাননি?”

শুনে বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বলে, “হ্যাঁ, সেটাই তো শেষ পর্যন্ত জানতে পারলাম না। জানো – জানো – মা বাবাকে অনেক খুঁজেছি – বোনটা শুধু কাঁদত – আমিও পাগলের মতো খুঁজেছি। কিন্তু – কিন্তু কিছু লাভ হয়নি, কিছু না।”

মাথা নিচু করে বৃদ্ধ আবার থামে, আবার বলতে শুরু করে বৃদ্ধ, “ওই দাদাটার বাড়িতেও থাকতে ভাল লাগত না। শেষ খবর যা পেয়ে ছিলাম – ঐটুকুই, মা বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছিল।”

আবার, উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধ বলে, “কয়েকজন শয়তান এমন কথাও বলেছে জানো – আমাদের মা বাবা নাকি আগে থেকেই ওই দাদার বাড়িতে, আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছিল – তুমি তো শিক্ষিত ছেলে বলতো – কোনও মা বাবা তাই করতে পারে – বলো – তাই কি পারে?”

মহাদেব খতমত থেয়ে বৃদ্ধকে শান্ত করার চেষ্টা করে, “দেখুন আপনি শান্ত হন, শান্ত হন, দেখুন এমনটাও তো হতে পারে আপনাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য এমনটা – মানে – মানে, আমি বলতে চাইছি এরকমও তো হতে পারে!”

বৃদ্ধ মহাদেবের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলে, “হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই সবাই বলেছিল।”

মহাদেব বৃদ্ধকে একটু স্বাভাবিক করতে বলতে শুরু করে, “আপনি যোগ্য মা বাবার যোগ্য সন্তান। আপনার বোন, সেও কবুগাম্মী মাতা।” মহাদেব বলেই চলে, “– আপনি আমার থেকে অনেক বড়, নতুন করে বলার কিছু নেই। শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই কয়েকটি কথা।”

মহাদেব এবার উত্তেজিত কর্তে বলে, “আপনি জানেন না, সেই সময় নেতাজীর অন্তর্ধানের কথা, আপনি শোনেনি কিশোর ক্ষুদ্রিরামের কথা, আপনি জানেন না বিনয়-বাদল-দীনেশ, প্রফুল্ল চাকী, মাস্টারদা সূর্য সেন- এঁদের কথা?”

মহাদেব বৃদ্ধের দিকে তাকায়, বৃদ্ধ এবার চোয়াল শক্ত করে বলে, “ঠিক ঠিক, একদম ঠিক।” মহাদেব এবার অভিযোগ ও অনুযোগের সুরে বলে, “সেই বাংলার রত্নগুলো সেদিন জেগেছিল বলেই গোটা ভারতবর্ষ তোলপাড় হয়ে গেছিল। যে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যে সূর্য পর্যন্ত অস্ত যেত না- সেই ব্রিটিশ সরকারকে খাপ্পরের বদলে খাপ্পর, বন্দুকের বদলে বন্দুক, গোলার বদলে গোলা দিয়ে জবাব দিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। তাই তো তারা পাগলের মতো গোটা ভারতের, প্রতিটা ঘরে ঘরে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল নেতাজীকে। নেতাজী, যার নামে আজও গায়ে কাঁটা দেয়- সেই বীর সন্ন্যাসী তিনিও ছিলেন, আমাদের শ্রী স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দীক্ষিত। তাইতো তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি ব্রিটিশ সরকারের পোষা পুলিশগুলো। জাপানে তখন যদি পরমাণু বিস্ফোরণ না হত দেশ আরো আগেই স্বাধীন হয়ে যেত।”

মহাদেব এবার থামে, উপরের দিকে মুখ তুলে আফসোস করে, “হায়রে মোর, সেই সোনার বাংলা, যাকে দেখে গোটা ভারত চেনা যেত, আজ সেই বাংলা কোথায় নেমেছে। বাংলা ভাষা বলতে আজকাল সবার সম্মানে লাগে। ইংরেজি না বলতে পারলে সে নাকি অঙ্কু!।” বৃদ্ধ, হঠাৎ চমকে ওঠে, বলে, “মানে – ?”

মহাদেব বলে, “হ্যাঁ, অবাক হচ্ছেন তো – এটাই এখন বাস্তব। বাঙলা, বাঙ্গালী আজ সবার কাছে নিজেনের বিকিয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু আমার মত কিছু অধম – যারা আজও বাংলার জন্য লড়ে যায়।”

মহাদেব এবার বৃদ্ধকে প্রশ্ন করে, “বলুন তো স্বয়ং স্বামীজী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী – জগদীশ চন্দ্র বোস, সত্যেন বোস – মুক্তি যোদ্ধা, সুভাষ বোস এদের থেকে বেশি ইংরাজি কি আজকের বাঙালীরা শিখেছে? তাঁরা বাংলায় কথা বলতেন না কোনও দিন-বাঙালী বলতে কি নিজেরা কোনও দিন লজ্জা পেয়েছেন! মাতৃভাষা বলতে লজ্জা! ইংরাজি ভাষা শেখা মানে কী মাতৃভাষা বাংলা কে ভুলে যাওয়া, উপেক্ষা করা।”

বৃদ্ধ অবাক হয়ে শুনছিল। এবার হেসে ফেলে, “কে বলে সোনার বাংলা নীচে নেমে গেছে- তোমার মত বীর পুত্র, এতো ভালোবাসা তোমার – এত নাম ডাক তোমার – তোমার হাত ধরেই বাংলা আবার ঘুরে দাঁড়াবে।”

মহাদেব হাত জোড় করে শুধু বলে, “আপনি আশীর্বাদ করুন সেটুকু যেন পারি – আর নিজের কাজ করতে গিয়ে কখনও যেন কোনও রকম প্রলোভনে পা না দিই – নিজেকে বিকিয়ে না দিই।”

তারপর হঠাৎ মহাদেবের মনে পরে বৃদ্ধের অসম্পূর্ণ জীবন কাহিনীটির কথা। তারপর মাথা নেড়ে বলে ওঠে, “দেখলেন কি বলতে কি বলা শুনু করেছিলাম। আপনার কথাগুলো শোনাই হলনা। ঐ যে – দাদার বাড়ি – তারপর কি হল?”

বৃদ্ধ বলে, “হ্যাঁ – হ্যাঁ – এবার বলছি। হে হে – সবই তো শুনলে, ছোট থেকেই খুব দারিদ্রের মধ্যে বড় হয়েছিলাম। মা বাবার স্নেহ সে ভাবে মনে নেই-” আবার গলাটা ধরে আসে, “- একটু বড় হলে – পেটের তাগিদে – এখানে সেখানে হোটেলে কাজ করতাম ও রাতে পড়াশুনা করতাম- একসাথে আমি আর আমার বোন। আমি ওই অস্টম শ্রেণীটা কোনো রকমে ভালো ভাবে পাশ করি। তবে আর খরচ সামলাতে পারছিলাম না। খিদের জ্বালা – একটা থাকার জায়গা – খুব দরকার হয়ে পড়েছিল – তারপরেই সিদ্ধান্ত বদলাই।”

বৃদ্ধ আবার একটু আবেগ তড়িত হয়ে বলে, “ছোট বেলায় ঐ ক্লাবের দাদাদের কাছেই কাগজের খবর দেখতাম, পড়তাম, দেশ দুনিয়ার খবর। যুদ্ধের যা

সব ছবি বেরোত, দেখে কত রাত থেতে পারেনি, ঘুমোতে পারিনি, হ্যাঁ ঐ জাপানের খবরটা দেখার পর মনে হয়নি আর বাঁচব- পরে মনকে বুঝিয়েছিলাম যে আমি একা নয়, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আজ সারা বিশ্বে এই যুদ্ধের শিকার। তবে কেন- কিসের ভয়? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, এর ইতিহাস আমাকে জানতে হবে, ভবিষ্যৎকে বাঁচাতে হবে। ভবিষ্যতে কারো কিছু যদি ভালো করতে পারি, এই অস্ত্রির মনটা, একদিন ঠিক শান্তি পাবে। আর আমি ছাড়া আমার বোনকে কে দেখবে? তাই ঐ দাদারা যা দিত তাই পড়তাম, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এত বুঝতামনা, শুধু মা বাবা ও স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদে একে একে যত বাধা, একে একে পেরিয়ে আজ আমি আমার স্বপ্ন কিছুটা হলেও সফল করেছি। তখন এই বাংলার ঘরে ঘরে কত মনীষীদের জন্ম, এত লেখা বই, সব শুনছি, কিন্তু ঐ যে বললাম পড়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। দাদাদের কাছে নিয়মিত কাগজ দেখতাম আর কাজের খবর খুঁজতাম। কয়েকজন দাদাই অবশ্য আমাদের অন্ধকার জীবনে, তখনই অনেক আলো ফুটিয়ে তুলেছিল। সাক্ষাৎ ভগবানের দূত ছিল তারা। তারপর একদিন সত্যি সত্যি, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এখানে চাকরিটা পাই। এইখানেই পোস্টিং পাই, বয়স তখন ষোলো কি সতেরো হবে।”

মহাদেবের মনের সব অন্ধকার যেন আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

বুদ্ধ বলে চলে, “-এখানে তখন থাকার মত কোনও কটেজ ছিল না, সব জঙ্গলে ভর্তি। রাস্তার ধারে অফিস থেকে অনেক দূরে, এখানকার ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরেই থাকতাম। প্রায় মাইল খানেক নীচে যেখানে এখন শহর, সেখানেই তখন কিছু মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরি ছোট ছোট ঘর ছিল। রাস্তার ধারে অফিসটাও তখন মাটির ঘর, টিনের চালার। রাতে যখন কাজে বেরোতে হত, গাছের উপরে মাচাতে বন্দুক নিয়ে জেগে থাকতে হত। তখন জঙ্গল এত ঘন ছিল সূর্যের আলো ঢুকতে পারত না, কোনও রাস্তাও ছিল না। এখন তো দিব্যি অফিসের গাড়ি ঢোকে, সে মাটির রাস্তা হলেও গাড়ি ঢোকান মত জায়গা আছে। কিন্তু তখন এত গাছ ছিল গাড়ি ঢোকান রাস্তা পাওয়া যেত না। তখন শুধু ঘোড়াই ভরসা ছিল। সেই প্রথম ঘোড়ায় চড়া শেখা। ভাবলেও কেমন লাগে, এখনও শরীরে কাঁটা দেয়। অনেকদিনের সখ ছিল রাজার মত ঘোড়ায় চড়ে ছুটে বেড়াব। সে সাধ পূরণ হয়েছিল। হয়ত কিছু পুণ্য করেছিলাম, বা হয়তো পুরোটাই কপালের লিখন ছিল। তবে আমাদের দুই ভাই বোনের উপর স্ত্রী ঠাকুর এর আশীর্বাদে কোনও খামতি ছিলনা।” বলে বুদ্ধ হাত জোড় করে নিজে নিজের কপালে ঠেকায়।



বৃদ্ধ আবার বলতে থাকে, “- তবে আমি আর আমার বোন কোনওদিন চুপচাপ বসে ছিলাম না। কারণ ছোট থেকেই পেটের জ্বালাটা আমরা দুজনেই খুব ভালো করে টের পাই। আর সেই জন্যই বোধহয় প্রাণের তাগিদে, আমাদের দুজনকে বাঁচতেই হবে- এই প্রতিজ্ঞা, এবং স□ পথে কিছু করে খেতে হবে; সেটা তখন থেকেই আমাদের রক্তে মিশে গেছিল। আমার মত, আমার বোনও ঘোড়ায় চড়তে ওস্তাদ। আমি তো সারাজীবন মানসিক চাপে ছিলাম যতদিন এখানে পুরোপুরি স্থায়ী ভাবে প্রধান এর কাজে নিযুক্ত না হই। প্রথমে অবশ্য এখানে দারোয়ানের চাকরি পায়, বোনকে সঙ্গে করে, এক নাম না জানা, এক অপরিচিত দেশের উদ্দেশ্যে শুধু পেট আর জীবন রক্ষার তাগিদে ঘর ছাড়ি।”

তারপর মহাদেবের দিকে চোখ ছল ছল করে বৃদ্ধ বলে, “তবে- কাজে যখন এখানে যোগদান করলাম, নিজের বহুদিনের খিদেটা সুদে আসলে মিটিয়ে নিয়েছি। যা কিছু খবরের কাগজ আসত, সব পড়তাম, ধীরে ধীরে বোনকেও সব বলতাম, সেও ঐ স্বপ্ন কাজের ফাঁকে সব পড়ত। না নতুন করে আর ইস্কুলে ভর্তি হয়নি, দরকারও হয়নি। যা এই অল্প জ্ঞান আজ তোমাকে বলতে পারছি, পাঁচটা মানুষের সাথে কথা বলতে পারি, তার পুরোপুরি কৃতিত্ব ঐ কালো অক্ষর গুলো আর ঐ দাদাদের শূভেচ্ছা।

তবে, আজ মনে হয় - তুমি অবশ্য ভালো জানবে - উন্নত সভ্যতার কিছু অসাধু ব্যবসায়ী - যারা আজ মানুষকে পঙ্গু করেছে - তারা, কত মানুষের রুজি কেড়ে নিল। আজ আমি এই জঙ্গল যদি ছেড়ে দিতাম জানিনা এদের কি হত!”

মহাদেব ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেয়, “আপনি ঠিক বলেছেন, আজ আপনার ও আপনার বোনের মহানুভবতা ও সেবায়, এই গোটা জঙ্গলের মানুষ সত্যি অনেক ভাল আছে। আমি নিজে চাকরি সূত্রে কত জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু এখনকার মত এত ভালোবাসা, আদিবাসীদের এত শৃঙ্খলা পরায়ণ জীবন কোথাও দেখিনি। কত জায়গায় এই আদিবাসীদের নিয়ে কোটি টাকার ব্যবসা চলে, কত জায়গায় এদের পশুদের সাথে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে দেওয়া হয়। তাদের সুরক্ষার জন্য কত ভালো ভালো সেক্সেসবী সংস্থা কত চেষ্টা করে, কিন্তু তাও সব সময় শেষ রক্ষা হয়না - আমাকে এখানে এসে তো সেরকম কোনো বাধারই সম্মুখীন হতে হয়নি। বরং প্রথম দিন এসে জঙ্গলের বিভিন্ন নিয়ম শৃঙ্খলা দেখে আমি সত্যি তাক্তব বনে গেছিলাম।” মহাদেব বৃদ্ধকে সম্মান জানিয়ে বলে, “আপনি সেই জন যিনি সত্যি এই জঙ্গলের একজন প্রধান নন - একজন সার্থক সেবক। স্বামীজি তো কতবার বলে গেছেন - জীবো প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

আবার, জীব অর্থে তিনি ছোট বড়, মানুষ অমানুষ কাউকে আলাদা করেননি। আর আপনি সেটাই এতদিন ধরে করে চলেছেন। আমি সত্যি বলছি, এখানে এসে আমি অনেক কিছু শিখেছি। বিশেষ করে আপনার সাথে কথা বলে আরও নিজেকে হাল্কা লাগছে।”

বৃদ্ধ হাল্কা হেসে মাথা নাড়ে, বলে, “না গো না, সেরকম কিছুই করিনি, শ্রী ঠাকুর যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন ততটুকুই পালন করি। ঐ দেখ না, যখন এলাম, কাজে যুক্ত হলাম শুধু দারোয়ানের কাজ করতাম, পড়ে এক বছরের মধ্যে আমার কাজ ও সাহস দেখে জঙ্গল রক্ষার দায়িত্বও পেয়ে গেলাম। প্রথমে, সঙ্গে দুই জন করে পাহারাদার থাকত। তখনও স্থানীয়দের সাথে পরিচয় হয়নি। সব ঠিক ঠাক ছিল একটাই অসুবিধে ছিল- আমার বোন। তখন তাঁর বয়স কম, ও আমার সাথেই চলে আসে এই জঙ্গলে। কিন্তু ভয় হত সব সময় ওর সুরক্ষা নিয়ে। শেষে ঠিক করি ওকে অফিসে রেখে আসব। তখন ওকে অফিসেই থাকার ব্যবস্থা করি। এতে একটা ভাল হয়। ও অফিসের রান্না করতো ও ছোট খাটো ফাই-ফরমাস খাটতো। থাকা খাওয়া সব নিখরচায় ছিল। নতুন অফিসে কাজ করতে ওর কোনও অসুবিধে হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি ও সবার কাছে প্রিয় হয়ে গেল। আর আমার দুজনেই যেহেতু ছোট থেকে ঠাকুরের অঙ্ক ভক্ত, তাই কোনওদিন কোনও বড় অঘটন ঘটেনি। শ্রী ঠাকুরের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে সব মানিয়ে উঠি আমরা। ছোট খাটো বিশৃঙ্খল ঘটনা যে ঘটেনি তা নয় তবে সব গুলিই আমার কুমারী বোনকে নিয়ে। কিন্তু আমরা ছোট থেকেই বিপদের পাহাড় পরিয়ে এত দূর এসেছি। ভয়টা আমাদের রক্তে ছিল না। তবে, কিছু স্থানীয় লোকদের নোংরা দৃষ্টিভঙ্গি আমার বোনের উপর পড়েছিল। বোন সেটা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে। তবে আমার বোন আমার মতোই কোমরে একটা বড় ছোরা গুঁজে রাখত। আর উত্তর পূর্বে থাকার সুবাদে আমরা ক্যারাটে, বক্সিং মোটামুটি ভালই জানতাম। আর বোনের রান্নাঘরে, হাতা খুঁটি তো থাকতই। সেই গুলোকে হাতিয়ার করে, যে সব অসভ্য মানব দেহী জানোয়ার খারাপ ব্যবহার করেছিল তাদের সব কটার চোখ ও খুঁচিয়ে নষ্ট করে দেয়। এরপর আর, ভয়ে আমার বোনের কাছে আর কেউ ঘেঁষতে ভয় পেত। এখনও ওর হাতের একটা থাপ্পড় খেলে যে কোনও যুবক ঐখানেই উল্টে পরে যাবে।

এভাবেই চলছিল বছর দুয়েক। তখনও এখানকার কোনও মানুষজনদের সাথে আমি সাক্ষাতে দেখা করার সুযোগ পাইনি। তখন এত চোরা কারবার, চোরা শিকারি ছিল না। বনের চতুষ্পদরাই রাজা- রাজার মতো রাজা। অনেক

বনমানুষও তখন থাকত এখানে। এখন তারা সব শেষ। আমি অবশ্য প্রচুর তীর খেয়েছিলাম এদের কাছ থেকে। কিছুতেই ওরা বাইরের লোকেদের সহ্য করেনা। তবে ঐ তীর খেলেও আমার, কখনওই কোনও কিছু হয়নি। স্থানিয় হাসপাতালে তখন অন্য এক বয়স্ক ডাক্তার থাকতেন। ওঁনার কাছেই ছুটে যেতাম আমার সাগরেদদের নিয়ে। তখন থেকেই একটা আভ্যেস তৈরি হয়। নিজে নিজেই গাছের লতা পাতা দিয়ে ভেষজ ওষুধ তৈরি শিখে ফেলি- ঐ বয়স্ক ডাক্তার বাবুই শিখিয়েছিলেন অবশ্য। তারপর থেকে কিছু হলে ওষুধ তৈরি করে আমি নিজেই সারিয়ে নিতাম। তোমায় দেখেছিল, ও ঐ ডাক্তারের ছেলে। যেমন বাবা ছিলেন তেমনি ছেলে। খুব ভালো গো, খুব ভালো। এই ডাক্তার তো এখনো আমার কাছে ওষুধের জন্য অনেক আলোচনা করে। তবে সেটা সবার অভ্যাসে। তোমাদের শরীরে বাঘ যে ক্ষত করেছিল যে কোনও হাসপাতালে গেলে কিছুই হত না। আমার নির্দেশে সবাই ওষুধ তৈরি করে এইখানেই। তারপর ভেষজ ওষুধ অল্প অল্প করে তোমাদের খাওয়ানো হয়।”

মহাদেব এবার জিজ্ঞেস করে, “কিন্তু রাতে মাচার উপর যখন থাকতেন তখন কোনও বিশেষ ঘটনা মনে পড়ে না, মানে খুব ভয়ঙ্কর, বা খুব ভালো কিছু?” বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বলে, “অবশ্যই, বাপরে! সে আবার বলতে, আজ অবধি এই যত বছর জঙ্গলে আছি প্রতি বছর বলতে পার একটা দুটো করে ঘটনা ঘটেছে। এই বিগত পাঁচ বছর থেকে আর সেরকম বিপদ হয়নি। এখনকার বিপদ বলতে ঐ চোরা শিকারিদের উৎপাত। সে কারণে এখন জঙ্গলও অনেক পাতলা হয়ে গেছে। আর এখন, এই ছোট ছোট করে ঘরের কটেজ গুলো - ভাঙ্গা চোরা হলেও - গোটা দশেক এখানে তৈরি করতে হয়েছে, তার মধ্যে একটায় তুমি থাকো।”

মহাদেব এবার মৃদু হেসে, মনে করিয়ে দেয়, “দুই চারটে ঘটনা তো বলুন, মনটা যে ছট-ফট করছে।”

বৃদ্ধ এবার হেসে ওঠে বলে, “দেখো, আবার ভুলে গেছি, হা হা- বলব - সব বলব - এক এক করে সময় করে - সব তোমাকে বলব। এই বুড়োটার পেটে যে আস্ত একটা মহাভারত ভরা আছে - এত ঘটনা আছে - বলতে গেলে রাত শেষ হয়ে ভোর হয়ে যাবে। তবে কি জানো ঝর্নার ওপাশটা এখনো সেই আগের মতোই রহস্যময়ী। এই দিকটা আমি সবকিছু জানলেও ঐ দিকটায় কাজের সূত্রে কয়েকবার গেছি, এখনকার কুনকি হাতি চেপে, কিন্তু বিশ্বাস করো- মাটি দেখা যায় না- এত অন্ধকার ভিতরটা। ইচ্ছে আছে তোমাকে নিয়ে ঐ দিকটাও

দেখব। আসলে, শুধু একা আর পেরে উঠছি না। এখানে চারটে সরকারি কুনকি হাতি থাকলেও আমার নিজের আবার বেশ কিছু শ্বাপদ ভাই বোন আছে।”

মহাদেব চমকে ওঠে, “মানে আপনি কি বলতে চাইছেন- বাঘ সিংহ?” বৃদ্ধ হেসে জিভেস করে বলে, “কেন ভয় পেলে নাকি- আরে ওরা ছোট থেকেই - আমার কাছেই বড় হয়েছে। আসলে, ছোট বেলায় - বাচ্চা আবস্থায় - ওদের আমি জঙ্গল থেকে উদ্ধার করি। আমার বোন তো ওদের এক বেলা না দেখে থাকতে পারেনা। আমার কোনও ক্ষতি না করলে ওরা কাউকে কিছু করেনা, তবে চেহারা দেখলে অনেকেই ভয় পেতে বাধ্য। ওরা হচ্ছে আমার এক সিংহ, এক সিংহী ও এক পাহাড়ি কালো চিতা।”

মহাদেব, নিজের মাথায় হাত রেখে বলে, “বাপরে- আপনি তো সাম্রাজ্য জঙ্গল রাজ।”

# ৬। ভূমিকম্প ও বর্তমান প্রধানের অভ্যুত্থান

মহাদেব এবার একটু প্রধানকে থামিয়ে বলে, “কিন্তু আপনার প্রধান হওয়াটা—”

প্রধান বলে, “হুম, ওটাই এবার বলছি। আমি একদিন রাতে ওরম শুয়ে আছি, হঠাৎ বাঘের গর্জন ও মানুষের আর্ত চিৎকার। আমি মশাল নিয়ে আমার সাগরেদেড় নিয়ে চট করে বেরোয়। দেখি এক পাল প্রায় শ-পাঁচেক লোক জন মশাল নিয়ে অস্ত্র নিয়ে ছুটে চলছে বাঘের পিছনে। আমরাও পিছু নি তাদের সাথে। বেশ কিছু এগিয়ে দেখি ঝর্ণার ধারে একটা বড় বট গাছে একটা বড় চিতা বাঘ এক যুবককে নিয়ে গাছে উঠে বসে আছে। যুবক ততক্ষণে আর ইহজগতে নেই। মাথা, হাত, সব গাছটা থেকে ঝুলছে। আর তাজা রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। সবাই মশাল, অস্ত্রশস্ত্র বাঘের দিকে ছুরতে থাকে। কিন্তু কোনও লাভ তো হলই না, উল্টে বাঘটা নিজের খাবার নিয়ে গাছের আরো উঁচুতে উঠে যায়। আমি বন্দুক তাক করছি ততক্ষণে আরও লোক জন গাছে চড়তে শুরু করে। আমি ভয়ে আর গুলি করিনি। যদি কোনও মানুষের প্রাণ চলে যায়। শেষে বাঘটিও বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়। মশালের আলোয় স্পষ্টভাবেই দেখতে পায়, মুখে করে খাবার নিয়ে একটা বিশাল লাফ দিয়ে অন্য গাছে চলে যায়। তারপর ঝর্ণার পাথরের বাঁক দিয়ে ওই পারে চলে যায়। গাছ থেকে মানুষ গুলো নামার আগেই সব শেষ।

হঠাৎ করে দেখি মাঝ বয়সী এক উলঙ্গ লোক মাটিতে বসে হাউ মাউ করে তীব্র কান্না জুড়ে দেয়। বুঝলাম বাঘের শিকার আর কেউ নয়, এরই নিকট আত্মীয়। আমার দারোয়ান দেড় জিজ্ঞাসা করছি, তখন ওরাও ভয় পেয়ে কাঁপছে। পরে বলে যে উনিই এই জঙ্গলের প্রধান। আর বাঘের মুখে যে চলে গেল সে এরই ছেলে, বলেই কেঁদে ওঠে। চোখের পলকের মধ্যে প্রধান নিজেকে সামলাতে না পেরে সেই বিশাল জলপ্রপাতে ঝাঁপ দেয়। আমি দৌড়ে এগিয়ে যেতে যায়। আমার অনুচরেরা আমাকে আটকে দেয়।

বলে, “যাইবেন না বাবু, ওরা আপনাকেও মেরে ফেলবে, ওরা যে আপনাকে চেনে না।” তারপর দেখি সব নরনারী একসাথে হাতে সাদা সাদা ফুল

নিয়ে ঝরনায় ছুড়ে দেয়, প্রধানের আত্মার শান্তি কামনার জন্য। সবার চোখে জল। তারপর শুনলাম প্রধানের বউ ও বাঘের শিকার হয়ে ছিলেন অনেক আগেই। ছেলেই ওর শেষ আশা ভরসা ছিল।

আমার অনুচরেরা আবার বলে, “বাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি চলুন, এখন এরা এক একজন আগুনের গোলা। তেড়ে আসতে পারে, চলুন পালাই।” ওদের কথাটা শুনে আমার কথাটা ভাল লাগেনি। তবুও নিজের চিন্তা, বোনের চিন্তা করে বাড়ি ফিরে আসার জন্য পিছন ফিরে ছুটতে থাকি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি- আমাদের চার জনকে সব আদিবাসী গুলো আগলে দাঁড়ায়। ওদের হাতে মশাল ও আগুনের ভাটার মত চোখ গুলো দেখে ভয়ে হাত পা শিথিল হয়ে আসছিল। চোখ বুজে বড় বড় শ্বাস নিতে থাকি। তারপর ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করি। মনে আবার জোর ফিরে পাই। হাত পা কাঠের মত শক্ত করি। যাই হোক বেঁচে ফিরতেই হবে নাহলে বোন যে আছে।

অবশেষে আমরা চারজন আদিবাসীদের হাতে, ধরা পড়লাম। আমার দরোয়ানরা এখানকার ভাষা কিছুটা জানত। আমি তখন এদের কিছু জানতাম না। আমার স্থানীয় অনুচরদের শত অনুরোধেও শেষ রক্ষা হল না। বরং আমাদেরও ওই তিনজনকে লতার ফাঁসে হাত-পা পিছন করে বেঁধে দেওয়া হলো। আমি যে কি করব আর বুঝে উঠতে পারিনা। তারপর আদিবাসীরা ঠিক পশুদের মতো আমাদেরও গলায় একটা লতার ফাঁস দিয়ে টান দিয়ে নিয়ে চলল, কোথায় তা জানিনা। গলায় মাঝে মাঝে এত টান পরছিল দম আটকে আসছিল। আমার অফিসের তিন অনুচরেরা তখন বুদ্ধি দিল - ওদের সাথে সাথে পা মিলিয়ে চলার জন্য বলল - না হলে, পিছিয়ে গেলে গলায় ফাঁস আটকে গেলে আরও বিপদ হবে। আমি তখন ওদের কথা মতো একটু দ্রুত পায়ে চলতে থাকি। যাতে গলায় টান না পরে। কোথায় যাচ্ছি তখনও জানি না। তিন অনুচরও যথেষ্ট দূরে দূরে, কথা বলার সুযোগও পাচ্ছিলাম না। অনেকদিন পর দেখলাম সেই বিশাল পাথর খণ্ডটার সামনে আমাদের চারজন কে নিয়ে এসে এক একটা গাছের সাথে বেঁধে দেওয়া হল।

এখন যেমন ওই পাথরের সামনে ফাঁকা জায়গা দেখছি তখন তা ছিল না। প্রচুর গাছ ছিল, তবে জঙ্গলটা ওখানে প্রথম থেকেই পাতলা।”

মহাদেব বলে, “তারপর...?”

প্রধান বলে, “আমি শুধু ঠাকুরকে ডাকছি, কি করে উদ্ধার পাব বলে। তার থেকেও বেশি চিন্তা বোনের জন্য। সে অফিসে একা, কি যে তখন মনের অবস্থা শুধু দর দর করে ঘামছি। তবে কি কারণে জানি না... ভয় লাগছিল বটে, কিন্তু মাথাকে একেবারে ঠান্ডা রেখেছিলাম। কারন জানতাম একবার যদি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ি সব শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমার দিকে একজন মশাল নিয়ে এগিয়ে আসে ও পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। পিছনে গিয়ে, ও পিঠে, পায়ে, কোমরে মশালের পিছন দিক দিয়ে থোঁচা মারে। জানিনা কি পরীক্ষা করছিল। তারপর আবার সামনে আসে ও মশাল দিয়ে আমার মুখের সামনে ধরে ও হনুমানের মতো দাঁত বের করে কি সব বলে। আমি এক দৃষ্টি দিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। পরে ধীরে ধীরে সে সরে গেল। দূরে আমার আর তিনজন সাগরেদকেও ওই ভাবে কি সব দেখল। যেহেতু আমার সাগরেদরা কিছুটা এদের ভাষা বুঝতো ওদের সাথে বেশ কিছু কথাও হয়। তারপর, তাদের কাছ থেকেও সে সরে গিয়ে পাথরের সামনে মশালটা তুলে হাত উঁচুতে করে চিঁকার করে কি সব বলে। সবাই দেখলাম হাত তুলে মশাল নিয়ে পাগলের মতো চিঁকার করতে লাগল। আমার অনুচররা আমাকে চিঁকার করে কি যেন বলছিলো। কিন্তু, কানে তখন, কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। ঈশারা তে শুধু বুঝলাম পালাতে বলছে। কিন্তু কি করে পালাবো? কোথায় বা পালাবো! হাত পা শক্ত করে গাছের সাথে বাঁধা। আর পালাতে গেলেও তো এদের তীর বা বল্লম খেয়ে মরতে হবে। আমি পালাইনি, বলা ভালো পালাতে চেষ্টা করেও সেই লতার বাঁধন খুলতে পারিনি। আমার গায়ে তখন শ্রী ঠাকুরের কৃপায় দ্বিগুণ ক্ষমতা ফিরে এসেছে। এদিকে উন্মত্ত আদিবাসীরা তখন লাফাতে লাফাতে ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গি করতে করতে এগিয়ে আসছে। উদ্দেশ্য, তখনও জানিনা। আমি শেষবারের মতো, প্রাণপনে পিছনে হাত বাঁধা অবস্থাতেই গাছের গুঁড়িটা নাড়াতে থাকি। প্রথমে ঝড় ঝড় করে পাতা ঝরলো। শুকনো ডাল পালা অনেক পড়ল, তারপর কিছু ফুলের মতো পড়তে লাগল। আমি মশালের গনগনে আগুনে, ফুলের রঙটা বুঝিনি। এদিকে আদিবাসীরা আমাকে বাঁধন খুলে, টেনে হিঁচড়ে পাথরের সামনে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। তখন বুঝলাম, এরা আমাকে শেষ করতে চায়। এদিকে চারদিকে তাকিয়ে দেখি, শুধু আদিবাসীদের হিংস্র মুখগুলো। সাগরেদ যারা ছিল, কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

এদিকে আচমকা, হঠাৎ করে দেখি একজন আমার গলায় ধরে টিপতে যায়। তারপরেই হঠাৎ দেখি সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পরে। পরক্ষণেই ভূত দেখার মতো দৌড়ে পিছনে পালায়। তারপর দেখি সবার মুখেই সেই আতঙ্কের ছাপ।

কিছুক্ষণ পরেই আরেকজন এক বিরাট পাথরখণ্ড দুহাতে মাথার উপর তুলে আমাকে ছুঁতে আসে, সাথে বিকট চিৎকার। তখন দেখি সে পাথর সমেত নিজেই উল্টে পরে যায় ও নিজেরই পায়ে পাথরটা পড়ে, এবং নিজের পাটা সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁতলে যায়। আমি প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিলাম। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখি সামনে যত আদিবাসী ছিল সব মাটিতে কেউ বসে পড়ে, বাকিরা চোখে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ে।

এদিকে আমিও বসেই ছিলাম। শুধু মাথাটা বনবন করে ঘুরছিল। তারপর দেখি চারপাশের সমস্ত চিৎকার সব চুপ, প্রায় আধঘন্টা। আমিও, এত মাথা ঘুরছিল চোখ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। যখন মাথা ঘোরা থামল দেখি চারদিক লন্ডভন্ড, প্রচুর গাছ পড়েছে। ভগবানের কৃপায় তিন অনুচরের কিছু হয়নি। তারা যেমন ছিল তেমনি বাঁধা আছে। তারপর তারা চিৎকার করে বলল আসল ঘটনা।

হঠাৎ করে সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়। প্রচুর পাথর এদিকে ওদিকে পড়েছে, প্রচুর গাছ পড়েছে। আমি যেহেতু বসেছিলাম ভূমিকম্পটা বুঝিনি, শুধু মাথা ঘুরছিল। তখন বুঝলাম, কেন প্রথমজন আমার গলা টিপতে এসে নিজের মাথায় হাত দিয়ে পালিয়ে যায়। কারণ তখন তার মাথা ঘুরে উঠেছিল।

দ্বিতীয় জন যে বিশাল পাথর নিয়ে আমার মারতে আসে সেও মাথা ঘুরে পড়ে যায়। নিজেকে সামলাতে না পেরে পাথরটা ও তাঁর পায়েই পরে।

তারপরের ঘটনা আরো নাটকীয়। ধীরে ধীরে যত আদিবাসী ছিল সব যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। শুধু পরেছিল পাঁচ জন আদিবাসী, দুই জন পুরুষ ও তিনজন নারী। এই দুই জনের মধ্যে একজন হল সে, যে প্রথমেই মশাল নিয়ে আমাদের চারজনকে পরীক্ষা করছিল। তার মুখ তখন যতটা ভয়ঙ্কর ছিল, এখন ততটাই ভয়ে তটস্থ। তারপর পাঁচজন আদিবাসী পুরো জায়গাটাতে মাটিতে কি যেন খুঁজছিল। অনেক্ষণ পরে দেখলাম আমাকে যে গাছটাতে বাঁধা হয়েছিল সেই গাছটার নীচে গিয়ে, পাঁচ জন কি যেন বলাবলি করছিলো। পাথরের সেই বিশাল শীলা থেকে ওই গাছটা যথেষ্টই দূরে ছিল। আমি ভালো করে বুঝতেও পারছিলাম না। শেষে দেখলাম তিনজন নারী মাটি থেকে হাতে কি যেন তুলে পুরুষ দুজনকে দেখায়। শেষে তিন জন নারী, চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে, আমার পাদুটো জাপটে ধরে। আমি চমকিয়ে উঠি, কোনও রকমে একটু সরে বসি। হাত পা তখনও বাঁধা। আমি ঈশারা করে বলি আমার বাঁধন খুলে দাও। সাথে সাথে ওই তিন জন নারী আমার বাঁধন খুলে দেয়।



সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ দুটোও ছুটে আসে ও আমার কাছে কান্না জুড়ে দেয়। আমি সোজা হয়ে বসে, ঈশারায় ওদের বোঝানোর চেষ্টা করি আমি ঠিক আছি। পরে দেখলাম ওরা যখন শান্ত হল তখন আমি তাদেরকে ঈশারায় বললাম, আমার অনুচর তিন জনের, বাঁধন খুলে দিতে। সাথে সাথে পুরুষ দুজন দৌড়ে গিয়ে তাদেরও বাঁধন খুলে মুক্তি দেয়।

সবই তো হল, এবার আমি ভাবতে থাকি এমন কি হল যার জন্য এরা আমায় মুক্তি দিল। এদিকে, কাল বিলম্ব না করে, আমার অনুচরগণ, যত রাগ ছিল সেই আদিবাসীগুলোকে চরম ধমকের সুরে ওদের ভাষায় বোঝালো যে ওরা কত বড় অপরাধ করতে যাচ্ছিল। তারও কিছুক্ষণ পরেই দেখি আদিবাসীরা কেমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

যেন আগে কোনও দিন মানুষ দেখেনি। আমি একজন দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় সে আদিবাসীদের জিজ্ঞাসা করে যে কি হয়েছে যে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে।

সাথে সাথে আদিবাসী তিন নারী তাদের হাতগুলো খুলে দেখায়, দেখি বেশ কিছু সাদা ফুল। দারোয়ান এবার আমায় বলে ওই ফুল এখানকার খুব শূভ, যার গায়ে লাগে বা মাথায় লাগে তার কোনও দিন ক্ষতি হয়না। আর আমার ভাগ্যও খুব ভাল ছিল ওরা আমাকে ওই ফুল গাছেই বেঁধেছিল। আমি ভীষণ জোরে যখন গাছটা নাড়ায়, প্রচুর ফুল ওখানে গাছ তলায় পড়েছিল। এই ফুল দিয়েই এই বিশাল প্রস্তর খণ্ড যাকে এই আদিবাসীরা, বন দবতা বলে মানে, তাঁর পূজা করে। এবার আমি চোখ বন্ধ করে শ্রী ঠাকুরকে আগে প্রণাম জানায়, এই বিশাল বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম বলে। প্রণাম জানিয়ে, আমি ওই নারীদের হাত থেকে ফুল নিয়ে পাথর খন্ডের নীচে ছড়িয়ে দিই।

তারপর আমি নতজানু হয়ে সেই বনদেবতাকে প্রণাম করি। আমাকে দেখা দেখি আমার অনুচরেরা ও উপস্থিত আদিবাসীরাও উপুড় হয়ে প্রণাম করে।

তারপর যে পুরুষটি আমাকে মারার পরিকল্পনা করেছিল, সে হঠাৎ কোথা থেকে একটা পাতা ও পালকের মুকুট এনে আমাকে পড়তে যায়। আমি পড়তে নারাজ, তাঁর ভাব-ভঙ্গি বুঝে উঠতে পারছিলামনা। সেও দেখি হাত জোর করে ঐ মুকুট, মাথায় পড়তে ঈশারা করে। আমার অনুচর সকলেই বলে ওটা পড়ে নিতে,

এতেই নাকি ভাল হবে। আসলে তখনই ওরা আমাকে প্রধান বলে গ্রহণ করেছিল। আমিও তখন, দেরি না করে সেটা গ্রহণ করি।

সাথে সাথে পাঁচ জন আদিবাসী অদ্ভুত একটা ভাষায় তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। আমি আবার একটু ঘাবড়ে যাই। আমার তিন সহচর ঈগিতে বলছিল ওরা নাকি আমাকে নতুন প্রধান হিসাবে মেনে নিয়েছিল, সেই বার্তাটা জঙ্গলের সকলকে জানাচ্ছিল। তাই পুরো জঙ্গল আবার সেই খবর ছড়িয়ে দেয়।

সাথে সাথে আবার সবাই মশাল নিয়ে দৌড়ে আসে, তবে এবার সংখ্যায় আরো বেশী। বিশেষ করে বহু নারী তাঁদের সন্তানদের কোলে নিয়ে ছুটে ছুটে চলে আসে।

উফ্, তারপর সে এক কাণ্ড। আগের পাঁচজন তো ছিলই, বাকিরাও যেখান থেকে পারল, সেই সাদা ফুল মুঠো মুঠো করে হাতে নিয়ে এসে, আমার পায়ে দিতে আসে। আমি খুব লজ্জায় পড়ে গেছিলাম। আমি সবার কাছ থেকে হাতে হাতে ফুল নিয়েছিলাম। তারপর আমি যখন দাঁড়িয়ে তখন দেখি, আর সবাই বসে পরে আমাকে প্রণাম করে।

হে ভগবান, ভাবলেও কেমন যেন লাগে! কি থেকে কি হল, একমাত্র শ্রী ঠাকুর জানতেন। আমি অবশ্য সারাঞ্জন ঠাকুরকে ডেকে গেছিলাম। তার জন্যই তিনি আমাকে বোধহয়, আদিবাসীদের কাছে অপরাধী থেকে প্রধান বানিয়েছিলেন।”

এবার বৃদ্ধ একটু থামে, তারপর বলে, “ওই যে আদিবাসী পুরুষটি আমাদেরকে বন্দি করেছিল ও আমায় মারার হুকুম দিয়েছিল, পরে জানতে পারি সেই ছিল জঙ্গলের আরেক মাথা। ওর হুকুম আদিবাসীরা ভীষণ মানত। কারণ ওর মাথা ছিল খুব পরিষ্কার। পরে বহুবীর ও আমার কাছে আসে ও বহুবীর ক্ষমা চাই। শুধু তাই নয় ও বহু বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করেছিল এবং সুচতুর ভাবে।”

মহাদেব এতক্ষণ সব শুনছিল। এ জীবনে, বহু ইতিহাস সে পড়েছে, এ এক সম্পূর্ণ আলাদা, এক অনন্য, অভূতপূর্ব অরন্য ইতিহাস।

এবার, বৃদ্ধ ঘুল ঘুলির ফাঁক দিয়ে দেখে বলে, “ঐ দেখেছ? ছি ছি, এত রাত! রাত শেষ হতে চলল। ঐ দেখ শুকতারা আকাশে উঁকি মারছে, আর হয়তো দুই তিন ঘন্টা রাত আছে। চলো এবার শূয়ে পর।”

## ৭। ডাক্তারের আন্তরিক সেবা

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মহাদেব দেখে, হারাধন, সেনাই, হাবল ও বিশালদেহী সেই মানুষটি সবাই মিলে লতাপাতার ওষুধ নিয়ে হাজির। সাথে ডাক্তারও উপস্থিত। কিছু ওষুধ প্রধানের হাতে তুলে দেয়। ডাক্তার সকলকে দেখে আশ্চর্য হয়ে মহাদেবকে বলে, “আজ জঙ্গল মহলও আপনাকে পেয়ে ধন্য। আবার আপনিও আপনার যথার্থ স্থান পেয়ে ততটাই খুশি।”

মহাদেব একটু হাসি মুখে বলে, “সবই শ্রী ঠাকুরের আশীর্বাদ ও আপনাদের ভালোবাসা।”

ডাক্তার প্রধানকে জিজ্ঞাসা করে, “স্যার কিছু খেয়েছেন?” প্রধান বলে, “হ্যাঁ ঐ ভেষজ তুমি যা বলেছিলে সেটা দিয়েছি, আর এই একটু গরম চা খেয়েছে।”

ডাক্তার আবার প্রধানকে মনে করিয়ে দেয়, “আপনি তো জানেন এত রক্ত ঝরনের পর ভাল ভাল প্রোটিন খাওয়া খুব দরকার। সাথে হারাধন ও সেই ছেলেটিকেও একই খাবার দিতে হবে। মুরগীর মাংস হাঙ্কা লবণ দিয়ে ঝোল দেবেন। আর এখানকার যে ডাল জাতীয় কলাই, সেটাও লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে খাওয়াতে পারেন।”

প্রধান বলে, “ঠিক আছে।”

তারপর ডাক্তার, খুব ধীরে ধীরে মহাদেবের হাতের, পায়ের, বুকের-সমস্ত লতা পাতার প্লাস্টার খুলে ফেলেন। ডাক্তারের এহেন ধীরে ধীরে কাজ করাটার কারন মহাদেব বুঝতে পারে, যাতে কোনও ব্যাথা না হয় বা আর রক্ত না বেরোয়। মহাদেব মুচকি হেসে বলে, “ভয় নেই ডাক্তার বাবু আপনি তাড়াতাড়িও খুলতে পারেন। ব্যাথা অনেক কমে গেছে। তবে শিরশিরানিটা গোটা গায়ে আছে।”

ডাক্তার বলে, “আপনি কী পাগল মানুষ বলুন তো! একদিনে সব ভাল হয়ে যাবে! একি ম্যাজিক নাকি! ব্যাথা কম বলছেন, এতেই তো আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।”

মহাদেব হেসে ফেলে। বলে, “এত ভাল ভাল খাবার খাচ্ছি, ঘুমচ্ছি, সেবা পাচ্ছি- এরপরেও ভাল হব না। ব্যাথা কমবে না তো বাড়বে নাকি-” সবাই হেসে ওঠে।

কিন্তু যখন মহাদেবের দেহ থেকে সমস্ত আবরণ খোলা হল, ডাক্তার শিউরে ওঠেন, “ওরে বা-প-রে, কি সাংঘাতিক- এখনও চটা রক্ত গোটা গায়ে- দগদগে ঘা আর আপনি বলছেন- ব্যাথা কমে গেছে-”, হারাধন, সেনাই, বৃদ্ধ- সকলে হাঁ করে দেখে, মহাদেবের ক্ষত বিক্ষত দেহ।

ডাক্তার চটপট ব্যাগ থেকে দুটো ইঞ্জেকশন মহাদেবের দুটো হাতে একটা একটা করে দেয়। পরে আবার একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ জল দিয়ে খাইয়ে দেয়। শেষে, মহাদেবকে জোড় হাত করে অনুরোধ করে, “স্যার, একটা কথা বার বার আপনাকে বলছি যে, যে কদিন এখানে আছেন ভালো করে থাকবেন। আপনার মনের মত জায়গা, এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, বেশ কিছুদিন। ওষুধ আমি নিয়মিত দিয়ে যাব বা কারো হাত দিয়ে পাঠিয়েও দিতে পারি, তবে নিয়ম করে থাকবেন।” তারপর, সমস্ত ওষুধ ও খাওয়া দাওয়া একটা সাদা কাগজে লিখে দেয়। পরে পুরো ক্ষত স্থান ডাক্তার ধীরে ধীরে হাল্কা গরম জল ও ওষুধ দিয়ে ধুয়ে দেয়। শেষে আবার কিছু ভেষজ লতা পাতা ও কাপড় দিয়ে ক্ষত স্থান গুলি মুড়িয়ে দেয়।

এতক্ষণ বাকিরা হা করে দেখছিল।

এবার ডাক্তার, হারাধনকে বলে, “হারাধন, কই এস, তুমি এস তোমাকে এবার দেখব।” ডাক্তার একই মমতাই ও শূশ্রুষায় হারাধনকেও দেখে দেয়, সাথে ইঞ্জেকশন ও ওষুধ দিয়ে দেয়।

হারাধন আবার আবেগতড়িত হয়ে ছল ছল চোখে বলে, “বাবু আপনাদের এত দয়া- এ যে দেবতা ছাড়া কারও হয় না, আপনারা সাক্ষাৎ ভগবান। সত্যি বলছি, আগে কত বিপদ হইচে কেউ দেখতে আসে নাই।”

ডাক্তার এবার হারাধন কে একটু চুপ করিয়ে বলে, “-হারু, তোমাদের এই পাগলা স্যার আমাকে পাগল করে দিচ্ছে বুঝলে? নাহলে মাঝ রাত্রে কেউ এই জঙ্গলে বাঘের সাথে লড়াইে যায়! ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়।”

মহাদেব এবার একটু ধীর গলায় ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, “-ডাক্তারবাবু, আপনিও তো, সেই রাত্রে আমাদের জন্য ছুটে এসেছিলেন। কেন বলুনতো?”

ডাক্তার বলে, “আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র।”

মহাদেব মাথা নেড়ে হেসে বলে, “আমিও আমার কর্তব্য করেছি মাত্র, ভালোবাসা ভালোলাগা একতরফা হয়না ডাক্তারবাবু।”

ডাক্তার এবার লাস্জায় জিত কাটে, বলে, “তোমাদের স্যার কত বড় মানুষ তোমরা জান না। এখানে এসে আমি সব কিছু ভুলে যায়। তোমাদের সেবা করতে পারলে আমারও খুব ভাল লাগে। মনে হয় কত জন্ম পুণ্য করেছি, তাই তোমাদের সেবা করতে পারি।” বলে ডাক্তার একটু চুপ করে যায়। মহাদেব এবার জিজ্ঞেস করে, “ওই ছেলেটি কে দেখে দেবেন না?”

পুনরায় ডাক্তার লজ্জিত হয়ে বলে, “স্যার এ ভাবে বলবেন না। অবশ্যই দেখব। ওরা এখানেই আসবে। ওর শুধু বুকটা খুব ভয়ংকর ভাবে ক্ষত হয়েছে। হাতে পায়ে সে রকম ভাবে কিছু হয়নি। আর ওকে তো আমি খুব কড়া ওষুধ দিতেও পাড়ছি না। বয়স কম, তাই ওকে একটু কম ওষুধ দেব। শুধু আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন ও যেন নিয়মিত ভাল খাওয়া দাওয়া করে যায়। আর সব থেকে বড় কথা, বাবা মার কাছে থাকলে এমনিই তাড়াতাড়ি সুস্থ ও ভাল হয়ে যাবে। আর সবাইকে বলছি লাগা জায়গায় দ্বিতীয় বার যেন না লাগে। তাহলে শুকোতে সময় লাগবে।”

পরে ডাক্তার, মহাদেব ও প্রধানকে বলে, “আপনাদের দুই জনের উপর অনেক দায়িত্ব দিয়ে গেলাম।” তারপর ডাক্তার অপেক্ষা করে সেই ছেলেটির জন্য।

এবার হাবল ডাক্তারকে এক গ্লাস গরম চা এগিয়ে দেয়। ডাক্তার বলে, “এই হচ্ছে আসল কাজের ছেলে। দে হাবলু, একটু গলাটা সঁক দিয়ে নিই।”

সবাই বেশ কিছুক্ষণ খোস মেজাজে গল্প করে। প্রায়, আধ ঘন্টা পরে, সেই ছেলেটি বাবার সাথে আসে ডাক্তারের কাছে দেখানোর জন্য। মহাদেব সাথে সাথে, একটু উঠে বসে ও বাকিরা একটু জায়গাটা ফাঁকা করে দেয়। প্রধান, আদিবাসী ভাষায় ছেলেটিকে নিয়ে চৌকিতে বসতে বলে। ছেলেটিকে নিয়ে তার বাবা তখন বসলে, ডাক্তার খুব আলতো হাতে ছেলেটির সমস্ত শরীর থেকে ধীরে ধীরে লতা পাতার মোড়কটা খোলে। ছেলেটি ভয়ে বাবাকে আরও বেশি আঁকড়ে ধরে ও কিছুক্ষণ পরেই চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়- ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায়। ডাক্তারবাবু ঈশারা করে প্রধানকে বোঝায়, ছেলেটির হা পা দুটো চেপে ধরতে যাতে নরতে না পারে। প্রধান সাথে সাথে ছেলেটির বাবা কেও সেই কথা বলে।

ছেলেটি আরও জোরে কাঁদতে থাকে। ডাক্তার চট পট বুকের কাছটা ওষুধ দিয়ে হাল্কা গরম জলে চটা ধরা রক্তে, সব ধুয়ে ফেলে। “উপফ- বা-প-রে”, বলে ওঠে ডাক্তার ও মহাদেব একসাথে।

মহাদেব উত্তেজিত হয়ে বলে, “ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি করুন, এ যে চোখে দেখতে পারছি না-বুকটা কি অবস্থা!” ডাক্তার কোনও উত্তর দেয় না, ঝট-পট তুলো দিয়ে ওষুধ মিশিয়ে, পুরো ক্ষতস্থানে আবার লাগিয়ে দেয়। তারপর মাটির পাত্রে জল দিয়ে একটু ওষুধ মিশিয়ে, ছেলেটির বাবাকে ঈশারা করে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিতে। ছেলেটি কেঁদেই যায়। ওর বাবা থাওয়াতে পারে না। প্রধান এবার উঠে আসে ও ছেলেটির মুখটা হা করিয়ে কোনো রকমে খাইয়ে দেয়। ডাক্তার হাঁপ ছেড়ে বলে, “ধন্যবাদ প্রধানবাবু। এই ওষুধটা না খেলে ব্যাথা কমত না। এটা দিনে তিনবার থাওয়াতে হবে। প্রধানবাবু আপনি কিন্তু মনে রাখবেন। আপাতত আর কারো প্লাস্টার খোলার দরকার নেই। ঠিক এক মাস পর আশা করছি সব ঠিক হয়ে যাবে।”

বেশ কিছুক্ষণ পর ছেলেটি চুপ করে হাঁপাতে থাকে ও সবার দিকে চোখ মুছতে মুছতে তাকায়। সবার মুখে হাল্কা হাসি। প্রধানের কাছে একটা মাটির খেলনা ঘোড়া ছিল। প্রধান সেটা ছেলেটিকে দিয়ে ওদের ভাষায় বোঝায় আর কোনও ভয় নেই। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে ঘোড়াটা নিয়ে মুছকি হেসে ওঠে।

বোঝা গেল ছেলেটির ব্যাথা কমেছে। সবাই আবার একসাথে গল্প- আড্ডা জুড়ে দেয়। ছেলেটিকে নিয়ে তার বাবা সবাইকে জোর হাতে প্রণাম করে চলে যাচ্ছিল। প্রধান হঠাৎ তাকে হাঁক দিয়ে তাদের ভাষায় বোঝায় যে সাবধানে থাকতে ও প্রয়োজন হলেই যেন প্রধানের সাথে দেখা করে। তারপর তারা চলে যায়।

ডাক্তারও ঘড়ি দেখে বলে, “এবার আসি, কাল থেকে খুব চিন্তায় ছিলাম কে কেমন আছে তাই নিয়ে। যাই হোক আর ভয় নেই। ওষুধ গুলো আর প্রোটিন খাবার সবাই খান। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবেন।” মহাদেব বলে, “কিন্তু আপনি যাবেন কিসে করে?” ডাক্তার হেসে ওঠে, “এই যে আমার পৈত্রিক সাইকেল, আমার প্রানের বন্ধু।” মহাদেব আবার হয়ে জিতেস করে, “এটা আপনার বাবার? এখনও...!”

ডাক্তার একটু আবেগান্বিত হয়ে বলে, “-হ্যাঁ, এটা আমার বাবার কলেজ জীবনের। বাবা সব সময় বলত যে কি দরকার মোটর বাইক বা চার চাকার? ওতে অর্থ- শরীর দুটোই শেষ হয়। বাবাকে কোনোদিন সাইকেল ছাড়া অন্য কিছুতে চড়তে দেখিনি- সে যতদূর হোক, সাইকেলই ছিল বাবার সাথী। আমিও, তাই এটাকে বাবার স্মৃতি বলুন আর বাবার জীবনের আশীর্বাদ বলুন- এটাই আমার সব।” বলে, ডাক্তার একটু হাসে ও কাজে বেড়িয়ে যায়।

মহাদেব শুধু দেখে যায় মানুষের বিবেক কত উঁচু আর কত পবিত্র হতে পারে। এখানে কত রকমের মানুষ, সবাই ভাল- শুধু নিতাইয়ের মত কিছু লোকজন ছাড়া।

তারপর প্রধান, হারাধন, সেনাই, হাবল ও মহাদেব সকলে প্রাতরাশ সেরে একটা বিশালাকার অতিপ্রাচীন বনস্পতির তলায় ছোট ছোট পাথরের উপর বসে অনেকক্ষণ গল্প করে। ধীরে ধীরে, মহাদেবের হাঙ্কা ঘুম পায়। বুঝতে পারে, রাত্রে ঘুম হয়নি। হাবলকে, মহাদেব বলে এক কাপ কড়া করে চা করে নিয়ে আসতে। মহাদেব আর ঘুমোতে চাইনা। সেও যে প্রকৃতির এক আবিষ্কেদ্য অঙ্গ। এবার মহাদেব জিজ্ঞেস করে সেনাইকে, “আচ্ছা, আমি তো এখানে, এদিকে অফিসের কি হাল? ওখানে সবাই এসেছে তো- নিতাইকে নিয়েই যত চিন্তা- এই সময়ই কি করবে কে জানে! আচ্ছা একবার অফিসটা ঘুরে এলে হত না?”

হাবল চা করে নিয়ে এসে মহাদেবকে দেয়। মহাদেব চায়ে চুমুক দিয়েই বলে, “আঃ, খাসা!” হাবল বলে, “বাবু আপনারা যা করিদি তাই তো ভাল বলেন।” বলে হাবল লাজ্জা পায়। মহাদেব আবার সেনাইকে বলে, “কি হল সেনাই? কিছু বল।”

সেনাই উত্তেজিত হয়ে বলে, “হুজুর অফিসের চিন্তা আখন ছেরি দিন, নিজে আগে ঠিক হন দিকি -আর নিতাই কি করবে কি- আমরা কি নাই নাকি?” প্রধান, সেনাইকে থামিয়ে, মহাদেবকে আশ্বস্ত করে বলে, “সকালেই আমার বোন ও ডাক্তার বাবু আমার লেখা চিঠি নিয়ে অফিসে গিয়ে পিয়নকে দিয়ে এসেছে। সবাই তোমার খবরে গর্বিত, তবে তোমাকে দেখার জন্য তারা এখন পাগল। এত বড় কাজ তুমি যে করেছ, কেউ বিশ্বাস করতে পারছেনা।

তোমার গর্বে গোটা অফিসের সবাই আরও ভালো করে কাজ করছে। এটুকুই জানতে পেরেছি। তবে হ্যাঁ, ডাক্তারের নির্দেশ মত এখন কোথাও তোমার যাওয়া মানা- অন্তত দুই সপ্তাহ।”

মহাদেব মাথায় হাত দিয়ে বলে, “এতদিন বসে থাকা যায়- সব কাজ তাহলে এলোমেলো হয়ে যাবে।”

প্রধান বলে, “সবই তো বুঝছি কিন্তু এখন তো সত্যি উপায়ও তো নেই।”



## ৮। মহাদেবের বন্য অভ্যুতান

মহাদেব এরপর, বলা বাহুল্য, বেশ কিছুদিন প্রধানের বাড়িতেই বহু যত্নে, সেবা-শুশ্রূষায়, ধীরে- ধীরে পুরনো সক্ষমতা ফিরে পায়। এদিকে প্রাণের হারাধন, সেনাই, হাবল, সেই কিশোরটি সকলেই মহাদেবের নিত্যদিনের আনন্দে সামিল হয়ে যায়।

এদিকে ডাক্তার বাবু মাঝে মাঝে ছদ্ম বেশে মহাদেবের ও বাকিদের খোঁজ নিয়ে যেতেন।

দুই সপ্তাহ পর আবার ডাক্তার মহাদেবকে পুরোপুরি দেখে শুনে মাথা নেড়ে বললেন, “উঁহু নাহ, এখনি অফিস যাওয়া ঠিক হবে না। এখনও বুকের ও ঘারের কাছটা পুরো শূকোয়নি। আর কিছুদিন বিশ্রাম নিন- তারপর অফিস।”

শুনে, প্রধানও বলে ওঠে, ওকে রাত্রে ছাড়া কিছুতেই বিশ্রাম নেওয়াতে পারিনা, কিছু কথা শোনে না, আমিও বড় চিন্তায় আছি।”

মহাদেব মাথায় হাত দিয়ে বলে, “এখনও যেতে পারব না।”

ডাক্তার বলে ওঠেন, “দেখুন, আপনাকে তো আমি চিনি। আমি ছেড়ে দিতেই পারি কিন্তু আপনি অফিসে গিয়ে কাজ-কাজ-কাজ ছাড়া নিজের শরীর দেখবেন না।”

সেদিন রাত্রে, আবার প্রধান ও মহাদেব, খাওয়া দাওয়া সেরে, আবার গল্প জুড়ে দেয়। মহাদেব চিন্তিত হয়ে বলে, “দেখুন এতদিন অফিসে না যাওয়া একটা কিন্তু ভুল হচ্ছে। মানছি আমার আর কিছুদিন সারতে সময় লাগবে কিন্তু অফিস না গেলে – নিতাইকে নিয়ে আমার বড় চিন্তা হচ্ছে।”

প্রধান বলে, “ঠিক আছে আমি দেখছি, তবে, আজ আমার বাকি কথাগুলো তোমায় বলে আমি নিশ্চিত হতে চাই।”

মহাদেব ক্র কুঁচকিয়ে, বলে, “-মানে!?”

প্রধান এবার শান্ত গলায় শুরু করে, “জানো, আমার অবসরের পর অনেকদিন এখানে ভয়ে কেউ আসেনি। এই তুমি অনেকদিন পর আবার এলে।” প্রধান বলে চলে, “আমার বয়স হয়েছে, আমার বোনেরও তাই। তোমাকে আগেও বলেছি, এই জঙ্গলের প্রতিটা প্রাণী, গাছ-গাছালি, ধুলো-বালি, মানুষজন এক অদ্ভুত শক্তির অধিকারী। যেখানে যা ঘটুকনা কেন, জঙ্গলের প্রতিটা কোনায় কোনায় তা ছড়িয়ে পরে। এখানে যে বনদেবতাকে তুমি দেখেছ, উনি ভীষণ জাগ্রত। আজ পর্যন্ত এখানে কোনও স□ মানুষের ক্ষতি হয়নি। তাই বলে কি কোনও বিপদ হয়নি? সে তো জঙ্গল মাত্রই হয়ই। তবে ঐ যে বললাম আমি নিজের জীবন দিয়ে দেখেছি কোনও স□ মানুষের কোনও ক্ষতি হয়নি। অনেকদিন ধরে, অনেকদিন থেকে, আমি চাইছিলাম একজন স□ মানুষ, যে এই জঙ্গলকে বাইরের নোংরা জগ□ থেকে রক্ষা করবে তেমন কেউ আসুক। তাই তো, শ্রী ঠাকুর তোমাকে পাঠিয়েছেন।

বনদেবতা আমার কথা শুনছেন, রেখেছেন। তোমার মতো শিক্ষিত, সিংহ-হৃদয়, স□, পরপোকারি, অথচ আমারই মতো জঙ্গল-প্রেমী মানুষ এ জগতে আর সত্যি তেমন দেখা যায় না। আবার তুমি কত লেখা পড়া করেছ, কত ডিগ্রি তোমার। ইশ্বর না পাঠালে তোমায় কি পেতাম! তাই আমার বড় সাধ আমার পর এই জঙ্গলের ভার তুমি নাও। তবে, আমার ইচ্ছা যাই হোক, যতক্ষণ তোমার নিজের ইচ্ছা না হবে তুমি যেন এই দায়িত্ব নিও না। কারণ আমি কখনো কাউকে জোর করিনি, তোমাকেও করবো না।”

মহাদেব এক পলকে হাঁ করে সব শুনছিল, হঠা□ সম্ভিত ফিরে পায়। যেন এমনটাই মহাদেব চেয়েছিল। মহাদেবের গায়ের লোমগুলো উত্তেজনায় খাড়া হয়ে গেছে।

প্রধান আবার বলে, “আমার যোগ্য তুমি, এক মাত্র তুমিই হতে পারো। ভেবে দেখ, তবে খুব দেরি করো না। কারণ আশে পাশে অনেক লোকজন এই জঙ্গলের কাঠের লোভে মুখিয়ে আছে। আমি একা এখনকার আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পেরে উঠিনা। তাই তোমাকে বলছি আমার মনের কথা। তবে হ্যাঁ এখানে, থাকা খাওয়া সব পাবে, হাসপাতাল, ওষুধ সব পাবে। এমনকী পুরো জঙ্গলবাসীদের ভালোবাসাটাও আজ তোমার হাতের মুঠোয়।”

মহাদেব এবার কঁদে ফেলে, বলে, “আপনি আমার পিতৃ তুল্য। আমি এই কদিনে যে ভালবাসা পেয়েছি তা আমার বহু জন্মের পুণ্যের ফল। আমি থাকব, অবশ্যই দেখব, আপনার ইচ্ছে আমি পূরণ করবই। কই দিন আমাকে দায়িত্বভার...”

বলে মহাদেব মাথা নিচু করে বসে পরে। বৃদ্ধ প্রধান উঠে মহাদেবকে জড়িয়ে ধরে, আর দুইজনের আনন্দাশ্রু বাধ মানে না।

পরদিন সকালে, আবার, প্রধান সেনাইকে দিয়ে অফিসের খোঁজ নিতে পাঠায়। সেনাই ছদ্মবেশে ঘোরায়ে চেপে একছুটে রওনা দেয় অফিসের দিকে।

এদিকে হাবল ও হারাধন এসে খোঁজ দেয় নিতাই তাঁর জিপ নিয়ে বার দুই কটেজে এসে, কাউকে না পেয়ে, ফিরে গেছে।

মহাদেবের চিন্তা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। তবে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে, নিজের শরীর দ্রুত সারিয়ে তলার জন্য উঠে পরে লাগল। সকালের খাবার খেয়ে, প্রধানকে বলে, “চলুন আজ আপনার স্বাপদ ভাই বোনদের সাথে পরিচয়টা সেরে আসি।” প্রধান চমকে উঠে বলে, “পাগল নাকি- এই আবস্থায় তুমি ওখানে যাবে?” মহাদেবও জেদ ধরেছে সে আজ যাবেই, বেশি আদর যত্নে শরীর আরও অলস হয়ে পড়ছে। মহাদেব প্রধানকে বলে, “দেখুন আমাকে যদি এই জঙ্গলের দায়িত্ব নিতে হয় তাহলে আপনি আজ কেন বাধা দিচ্ছেন? এভাবে বাধা দিলে চুপ চাপ বসে থাকলে অফিস, জঙ্গল কোনটাই সামলাতে পারবনা; শুধু আশীর্বাদ করুন আর আমার ছোট ছোট কাজ গুলো সেরে ফেলতে দিন।” প্রধান কাঁচুমাচু করে বলে, “সেটা ঠিক, তবে চলা।”

মহাদেব ও প্রধান দুজনে, বনদেবতা যেদিকটায় আছেন, সেদিকে যেতে শুরু করে। মহাদেব কিছু না বলে চুপচাপ হেঁটে যায়। যেদিকটা ফাঁকা জায়গা, যেখানে সবাই পূজো দিতে আসে, তার উল্টো দিকে অর্থাৎ, বনদেবতার পিছনের দিকে জঙ্গলটা বেশ ঘন। সেদিকে দুজনে মিলে হাঁটতে লাগল। প্রধান এবার জঙ্গলে পড়ে থাকা বিরাট একটা বল্লম হাতে তুলে নেয়, মহাদেবকেও ঈশারা করে আরেকটা তুলে নিতে। মহাদেব বুঝতে পারে তারা প্রধানের পোষ্যদের কাছাকাছি চলে এসেছে। মহাদেব কোনও কথা না বলে আরেকটা বল্লম তুলে নেয়। তারপর জঙ্গলের অনেকটা গভীরে গিয়ে প্রধান মুখে একটা আঁদুত আওয়াজ করে বেশ কয়েক বার। মহাদেব হঠাৎ দেখে গাছের যত হনুমান ছিল সব ভয়ে চাঁচামিচি করতে করতে এ ডাল - ও ডাল করে, লাফিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

তারপরই গুরুগম্ভীর সেই গর্জন শুরু, একসাথে দুই তিন জনের। মহাদেব বল্লমটা শক্ত করে ধরে।

প্রধান বলে, “ভালো করে শোনো- যতক্ষণ না আমি বলব, তুমি কিছু করবে না- ওরা তোমায় চেনে না, তাই আমি না বলা অবধি এগোবে না।”

এসব বলাবলি হচ্ছে- হঠাৎ কালো চিতাটা মহাদেবের উপর ঝাঁপাতে যায়। প্রধান সাথে সাথে বল্লমটা তুলে, এক ধমক দিয়ে তাকে চুপ করে বসতে ঈশারা করে। পিছু পিছু সিংহ ও সিংহীটা অবশ্য হেলতে দুলতে এগিয়ে আসে। তাদেরকেও প্রধান ঈশারায় চুপ করে বসতে বলে।

মহাদেব এহেন দৃশ্য বা পরিস্থিতির আগে কখনও সম্মুখীন হয়নি। তাই অবাক ও বিস্ময়ে সব উপভোগ করছিল। ভয় যা ছিল আগেই কেটে গেছে। এখন সেও জঙ্গলের একজন। এবার প্রধান কাল চিতাটাকে আগে বশ মানায়, তারপর সিংহ ও সিংহীটাকে বশ করে। তিনজনেই প্রধানের আদর খেতে খেতে শূয়ে পরে।

প্রধান এবার মহাদেবকে ডাকে ও ওদের, গলায়- পেটে- পিঠে হাত বোলাতে বলে। মহাদেব, খুব সহজেই সিংহ ও সিংহীটাকে বশ করে ফেলে। তারা মহাদেবের হাত চাটতে থাকে। কিন্তু চিতাটা কিছুতেই গায়ে হাত দিতে দেয় না। শেষে প্রধানের হাতের এক চাপড়ে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। মহাদেব এবার তাকেও গায়ে মাথায় হাত দিয়ে শান্ত করে।

তারপর প্রায় আধ ঘন্টা প্রধান ও মহাদেব তাদের সাথে হালকা খেলে করে ফিরে আসে। এবার প্রধান বলে, “চিতাটা এখনও ছোট, এই এক বছর হল। তাই অত দূরন্ত। সিংহ সিংহী ওরা একটু বয়স্ক, ছয় বছরের।” মহাদেব বলে, “হুম, সেটা আন্দাজ করেছিলাম।”

মহাদেব এবার, প্রধানকে বলে, “ডাক্তার আমাকে যাই বলুন, আমাকে এর মধ্যে আর এক সপ্তাহের মধ্যে নিজেকে তৈরি হতে হবে, নাহলে নিতাইয়ের লোকজন অফিসের সব শেষ করে দেবে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।”

প্রধান মহাদেবের হাতে হাত রেখে বলে, “ঠিক আছে। তোমাকে কিছু জিনিস আমি খাওয়াবো, আমার নিজের তৈরি ওষুধ, তবে ডাক্তারকে বলোনা। আমার মান সম্মান থাকবে না। আসলে ওটা এখানকার একধরনের বনের মধু। ডাক্তার মানা করেছে, ওতে খুব পেট গরম হয়, আমরা খাই, আমাদের কোনোদিন ঠাণ্ডা লাগে না। ওতে অতি মাত্রায় ভেষজ গুন আছে। ওটা দিনে আমরা তিন বেলাও খেতে পারি, তুমি শুধু সকালে খেয়ো, শরীর একদিনে চাপ্সা হয়ে যাবে।”

এদিকে বিকেলের দিকে সেনাই ফিরে এসে খবর দেয়, “অফিসের খবর নিয়ে এসেছি, সব ঠিক আছে। নিতাই- ও একটু- আপনি তো জানেন, শুধু আপনার দেখা শুনো কাজ ছিল, তাই এখন- ঐ কাজে একটু ফাঁকি মারে- ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না বাবু।”

মহাদেব ঘাড় নাড়ে ও বলে, “সবই বুঝি, তবে কি জানো- বেরাল শুরুতেই মাড়া উচিঁ- না হলে বিপদ অনিবার্য।” সেনাই ও প্রধান মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়। প্রধান বলে, “কোনও চিন্তা করো না আমার লোক এই জঙ্গল থেকে সারাক্ষণ ঐ অফিসের উপর নজর রাখছে। সব গাছের উপরে বসে থাকে, সব খবর আমি পাই- এখনও কোনও ক্ষতি হয়নি।”

তারপর থেকে মহাদেবের শুরু হল, ডাক্তারের দেখাশুনো ও ডাক্তারের অবর্তমানে প্রধানের ওষুধ সেবন ও নিয়মিত শরীরচর্চা। সকাল থেকে উঠে রোজ এখনকার ভেষজ পানীয়, তারপর এখানে বন্য ঘোড়ায় চড়ে বনে বেড়াতে যাওয়া, স্নানের সময় বিশাল দীঘিতে স্নান করা- মাছ ধরা - সব যেন মহাদেবের নিয়ম হয়ে গেল। সাথে থাকত বিশ্বস্ত হারাধন, সেনাই ও মাঝে মাঝে হাবল। কারণ হাবল তখনও ঘোড়ায় চড়া শেখেনি। তারপর, খাবার সময় যেন পেটে ছুঁচোয় ডন দিত। সবাই দৌড়ে গিয়ে একসাথে খাওয়া দাওয়া, যেন এক অজাগতিক অথচ অকৃত্রিম বন্য পরিবেশ।

“সত্যম শিবম সুনন্দরম” আকাশে বাতাসে গহন অরণ্যে সর্বত্র, বিরাজ করত।

ঠিক তিন দিনের মাথায় মহাদেব সত্যি সত্যি পুরোপুরি চাঙ্গা। বরং দিগুন ক্ষমতায়।

## ৯। আদিবাসী বিবাহ

মহাদেব অনেকদিন পর পুরোপুরি সুস্থ। বৃদ্ধ মহাদেবকে সুস্থ দেখে খুব আনন্দ পায়, এক গাল হেসে বলে, “নিজে তো বিয়ে করনি বিয়ে বাড়িতে খেয়েছ নিশ্চয়ই- তা, এখানে তো কোনও বিয়ে থাওনি, খেতে যাবে? সামনেই একটা বিয়ে আছে। অবশ্য এরা বাইরের কাউকে বলেও না। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তো চলো একসাথে সবাই মিলে যায়। এতে তোমার আরও পরিচিতি বাড়বে। সবাই তোমাকে আরও কাছে থেকে চিনবে। যেটা ভীষণ জরুরী।” মহাদেব বলে, “না-না, এতে আবার কিসের আপত্তি?”

প্রধান বলে, “তাহলে, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো, তোমার সাথীরাও সাথে থাকবে। এমনিতেই তোমাকে সবাই ভালবেসে ফেলেছে, এমনকি সেও ইচ্ছে প্রকাশ করেছে তোমাকে বিয়েতে বলবে বলে। কিন্তু খুব সংকোচ করছে, আমি অবশ্য কথা দিয়ে রেখেছি আমরা যাব আর জমিয়ে এদের সাথে আনন্দ করব।” মহাদেব চমকিয়ে ওঠে, “বলেনকি? বিয়ে? হা- হা- আমি তো বললাম, এতে আমার কোনও আপত্তি নেই। অবশ্যই- আমি অবশ্যই যাব। ভালোবেসে কেউ যা দেয় তাই গ্রহণ করি। বিয়ের মত পূণ্য অনুষ্ঠানে ভালবেসে কেউ যা থাওয়াবে তাই খাব। এতে আপত্তি কেন থাকবে? যদি শ্রী ঠাকুরের আশীর্বাদ পাই আমরা ইচ্ছে আছে এখানে কিছু করার।”

সেদিন সকাল বেলা সবাই একসাথে, এক সুপ্রাচীন বনস্পতির ছায়ায়, প্রাতরাশ করার সময়, একজন সূর্য্যম দেহী সমবয়সী পুরুষ মহাদেবকে শুধু লক্ষ্য করে ও কি যেন হাত দিয়ে ঈশারা করে, আবার মহাদেব তাকাতেই লক্ষ্য মাথা নিচু করে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে মহাদেব তাকে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর, বিষয়টা প্রধানকে জানায়। প্রধান এবার বলে, “ও আচ্ছা, ঐ তো সেই আমাদের দেবা, যার ছেলের বিয়েতে তোমাকে বলবে বলে লক্ষ্য এখনও বলে উঠতে পারেনি।” প্রধান ডাক দেয় দেবাকে ওদের নিজেদের ভাষায়। লোকটি আনন্দে একছুটে চলে আসে প্রধানের কাছে ও করজোড়ে নমস্কার করে প্রধান ও মহাদেবকে। মহাদেবও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নমস্কার জানায়। তারপর দেবার সামনে, প্রধান, মহাদেবের সাথে দেবার পরিচয় করিয়ে দেয়- কিছুটা ঈঙ্গিতে কিছুটা অধো অধো ভাষায়। শুধু দোভাষী মাধ্যম হিসেবে প্রধান দুজনের মধ্যে কথা বলিয়ে দেয়।

শুনে মহাদেব খুব খুশি এবং ঈগ্গিতে বলে অবশ্যই সে বিয়েতে যাবে, অন্যদিকে দেবাও আনন্দে আটখানা, সাথে সাথে মহাদেবের পায়ে পড়ে প্রণাম করতে যায়। মহাদেব সাথে সাথে তাকে হতে ধরে তুলে বুক জড়িয়ে ধরে। হাতে ধরে উপর দিকে উঠিয়ে ঈশারা করে, প্রণাম ঈশ্বরকে করো আমায় নয়। আনন্দে চিৎকার করে দেবা উপস্থিত সবাইকে কি যেন বলে, মহাদেব বিন্দু বিসর্গও বোঝে না। এটুকু বুঝল যে সবাই খুব খুশি, সবার মুখে হাসি, আনন্দ। কেউ কেউ আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, নাচা- নাচি জুড়ে দেয়।

মহাদেব আবার নতুন করে আদিবাসীদের ভালোবাসার মায়ায় জড়িয়ে যায়। মহাদেব সেদিন প্রধানকে নিয়ে ধীরে সুস্থে সমস্ত গ্রামটা খুব অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখতে থাকে। প্রধান সেটা বুঝতে পারে ও জিজ্ঞেস করে, “কিছু জানতে চাইছ মনে হচ্ছে, নিঃসংকোচে বল। আমি যদি তোমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি।”

মহাদেব জিজ্ঞেস করে, “আচ্ছা, আমি তো কথা দিয়ে দিলাম যাব। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো আমি তো এখনকার কোনো ভাষা বুঝতে পারি না। ওরাও আমার কথা বোঝে না, সেদিন বিয়েবাড়িতে গিয়ে আমি কি করব তাই ভাবছি। আরও একটা কথা, আপনার এখানে তো খাওয়া দাওয়া ভালই, মানে আমাদের বাঙালি খাবারই রান্না হয়। কিন্তু বিয়ে বাড়ীতে এখানে এরা কি খায়? আসলে, সত্যি বলতে শাক- সবজি- ডাল, এসবে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু মাংসের ব্যাপারে আমার আবার একটু পছন্দ অপছন্দের-”

প্রধান মহাদেবকে খামিয়ে দেয় ও আশ্বস্ত করে, “কোনও চিন্তা নেই, মুরগির ঝোল তো খাও আর মাছে নিশ্চয় কোনও আপত্তি নেই। তুমি তো এই বিল থেকে মাছ নিজেই ধরে নিজেই হাবলকে বলতে রান্না করে দেবার জন্য।”

মহাদেব বলে, “না- না- তা নেই।”

প্রধান এবার বলে, “শুধু তোমার কথা মাথায় রেখে সেদিনের মাংস, অন্য কিছু না, এখানকার স্থানীয় বন মুরগির আয়োজন হচ্ছে। সাথে থাকছে এই বিলের যত বড় বড় সুস্বাদু মাছ।”

মহাদেব এবার একটু ভেবে বলে, “তাহলে তো এক দিক দিয়ে নিশ্চিত। কিন্তু বিয়েতে এখানে কি দেওয়া হয়- মানে, বর-কনেকে- আমি তো ভাল কিছু একটা দিতে চায়, কিন্তু কি দেব ভেবে পাচ্ছি না।”

প্রধান মহাদেবের ঘাড়ে হাত রেখে বলে, “দেখ বাচ্চাধন, ওই দেওয়ার চিন্তাটা আপাতত ছাডো, কারণ ওটা একটু অদ্ভুত, বিয়েতে সবই দেখতে পাবে। হয়ত তোমাকে বললে তুমি কিছু দিতেও পারবে, কিন্তু তোমাকে আমি এসব নিয়ে এখনি কিছু বলতে চাই না। তবে মন খারাপ কোরনা, আমাকেও খারাপ ভেবোনা, তোমার ভালর জন্যই বলছি। কারণ, এই জঙ্গলে সকলের মঙ্গলের জন্য তোমাকে লাগবে। তোমার কোনও ক্ষতি হোক আমি, আমরা কেউ চাইনা। তবে তোমার মনের অবস্থা আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। তুমি হয়তো ভালোবেসে কিছু দিতে চাইছ, সে তোমার যা ভালো লাগে দেবে। বাকিটা আমি সামলে দেব।”

মহাদেব খেমে গিয়ে বলে, “তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, কিছু দিতে গেলে কিছু বিপদ ঘটতে পারে-একটু খুলে বলুন না- এভাবে অন্ধকারে কেন রাখছেন-এতকিছু হল সব আপনি আমাকে বললেন- আমিও আপনার সব কথা মেনেছি-এর পর এখনও দ্বন্দ্ব কেন?-খুলে বলুন না-আমি না হয় এদের মনের মতই কিছু একটা দেব।” প্রধান, শেষে কোনও উপায় না দেখে বলে, “মন দিয়ে শোনো, বিয়ের প্রথা এখানে অবশ্যই আলাদা। সেটাতে তোমার কোনও আসুবিধে হবেও না। কিন্তু কি জানো? বর-কনে তুমি যাকেই যাই দাও না কেন- এদের মধ্যে ঝামেলা লাগবে। প্রথম হল বর বা কনের যদি জিনিষটা ভালো লাগে তো খুব ভালো না হলে তারাও তোমার উপর রেগে যাবে। এরপর, যারা বিয়েবারিতে আসবে তারা সকলেই আধুনিক জিনিস খুব একটা পছন্দ করে না, ঘেন্না করে। তুমি তো দেখেছ এরা এখনও কাপড় জামা পর্যন্ত পরে না। আমি কত চেষ্টা করে ঐ মেরে কেটে পঞ্চাশ জনকে কিছুটা ঐ লুঙ্গি মত ছোট ছোট করে কাপড় পড়া অভ্যাস করাতে পেরেছি। আর কিছুজন সাথে মেয়েরাও ঐ গাছপালার ছাল পরে থাকে। এরা শুধু খেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু সেদিন তো খাবার এমনি হবে। তুমি নতুন করে আবার কি দেবে বল। অনেক বিয়েতে দেখেছি জিনিস নিয়ে মারামারি হতে। তাই তুমি এর মধ্যে পরো আমি চাইনা। এবিষয়ে তোমার বিশ্বস্ত অনুচরেরাও আমাকে সাবধান করেছে যেন বাবু কিছু দিতে না যায় বিয়েবারিতে।”

মহাদেব বলে, “ওরে বাবা- না - না- তবে থাক। কোনও অশান্তি আমি চাই না।”



তারপর নির্দিষ্ট দিনে, বিয়েবাড়িতে প্রধান, মহাদেব, আরও তিন অনুচর সকলে মিলে উপস্থিত। সকলের চোখে মুখে আনন্দ উপছে পড়ছে। দিনের বেলাতেই অনুষ্ঠান, এটাই জঙ্গলের রীতি, যেহেতু রাত্রে বাঘ- সিংহ, আরও সব জন্তু জানোয়ারের উদ্ভাপাত।

হঠাৎ করে কোথা থেকে দেবা ছুটে এসে, সবাইকে প্রণাম ঠুকে, আমাদের সকলকে ছেলের ঘরের কাছে নিয়ে যায়, বেশ সুন্দর করে মুখে রং বেরঙের আলপনা মুখে, আর পরনে, অবশ্য গাছের ছাল, গলায় বেশ কয়েক গাছা মালা, মাথায় নানা রঙের পালকের মুকুট।

একটু পরেই কনের আগমন। তারও গোটা গা গাছের ছালে ঢাকা। কোমরে ও মাথায় ময়ূরের লম্বা লম্বা পালক। আর গলা ও বক্ষ যুগল একি ভাবে প্রচুর মালাতে ঢাকা। কেউ আজ উলঙ্গ নয়। আগত অতিথিরাও, সবাই কিছু না কিছু পরিধান পরে এসেছে। বিয়ে বাড়ি বলে কথা।

হঠাৎ পুরো জায়গাটা সুগন্ধিতে ভরে ওঠে। মহাদেব জিত্তেস করায় প্রধান বলে, “এটা বনের এক ধরনের ফুলের সুগন্ধি যা বিয়েবাড়িতে এরা ছড়িয়ে দেয়- তবে এর সুগন্ধ এত উগ্র, বেশীক্ষণ নিলে যে কোনও জনের মাথা ঘুরে যাবে। চার পাঁচটা ফুলকে এরা শীলে বেঁটে এক বালতি জলে গুলে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। এটা সেটুকুই তুমি পাচ্ছ।”

অবশেষে দুজনের মালা বদল হয়, ও দুই জন দুটো পাথর হাতে নিয়ে দাঁড়ায়। প্রধান এবার উঠে যায়, দুইজনের হাত থেকে পাথর দুটো নিয়ে মুখে কি সব মন্ত্রচারণ করে ছেলের হাতের পাথরটা মেয়েকে আর মেয়ের হাতের পাথরটা ছেলের হাতে দিয়ে দেয়। তারপর সবাই উলু দেয় ও বর কনে দুজনে প্রধানকে পায়ে প্রণাম করে। প্রধান আশীর্বাদ করে দুজনকে।

মহাদেব, পাথরের ব্যাপারটা হারাধনকে জিত্তেস করায় হারাধন বলে, “দুটি পাথর হল ঐ বনদেবতার নীচে পরে থাকা দুটি পাথর। এই দুটি আশীর্বাদ স্বরূপ দুজন দুজনকে দেয় যাতে বাকি দাম্পত্য জীবনটা এদের ভাল কাটে।”

বিয়ে হয়ে গেলে এবার খাওয়ার পালা। কলাপাতায় সারি দিয়ে সকলে মাটিতে বসে পরে। তারপর বিশাল বাটিতে মুরগির ঝোল আর সাত- আটটা মাছ

ভাজা দিয়ে গরম গরম ভাত। মহাদেব চটে পুটে খেয়ে বলে, “উফ- দারুণ - দারুণ-কি বল হারাধন?” “যা বলেছেন” হারাধন উত্তর দেয়।

বিয়েবাড়ি শেষে সকলে বাড়ীর পথে হাঁটা দেয়।

## ১০। ঝর্নার ওপার দর্শন

সেদিন সন্ধ্যার সময়, প্রধান মহাদেবকে বলে, “দেখ অফিসে ঢুকে গেলে এদিকে আর আসার সময় পাবে না। তাই ভাবছি কাল পরশুতে তোমাকে নিয়ে ঝর্নার ওদিকটা একবার দেখে আসব। আশা করি কোনও আপত্তি নেই।”

মহাদেব একটু গম্ভীর ভাবে বলে, “আমিও অপেক্ষা করছি সেই রোমাঞ্চ উপভোগ করার জন্য। আচ্ছা, কালকেই তাহলে চলুন বেরিয়ে পেরি। কুনকি হাতি তো আছেই, আপনার তিন স্বাপদকে নিয়ে আর আপনি যাদের ভালো বুঝবেন।”

প্রধান বলে “তাই ভালো, তিনটে হাতি- প্রত্যেকের পিঠে তিন চার জন করে বসে নেব- ঐ দশ বারোজন হলেই হয়ে যাবে। আমি, তুমি, হার্নু, সেনাই, মাহুত তিনটে, আর পাঁচজনকে জোগার করতে হবে যারা তীর ধনুক নিয়ে থাকবে। আর আমরা বন্দুক ছোড়া বল্লম নিয়ে থাকব।”

কথামত, সকালেই যাত্রা শুরু হল ঝর্নার ওপারের জন্য। ঝরনা সোজাসুজি পেরোনো সম্ভব নয় বলে, ঝর্নার ধার ধরে অনেক উপরে যেখানে ঝরনাধারা প্রস্বে অনেক ছোট, সেইদিক দিয়ে একে একে তিনটে হাতি ওপারে যায়। এবার প্রত্যেক হাতি পিছু এক জন করে মশাল জ্বালায়। সকাল বেলা, কিন্তু রাতের আন্ধকারের মত কালো ভিতরটা। সাথে সাহস বলতে প্রধানের তিন বন্য পোষ্য।

কিছুটা এগোতেই একটা হাতি ধরাম করে পরে যায় মাটিতে। ঐ হাতিটায় চারজন আদিবাসী ছিল। সবাই ভয় পেয়ে যায়। সবাই হাতি থেকে ধীরে ধীরে নামে। কিন্তু যে হাতিটি পড়ে গেল, সে শূঁড় তুলে চিৎকার করে জানান দেয় তার যথেষ্ট লেগেছে।

সবাই ঝটপট পড়ে যাওয়া হাতিটিকে দেখতে গিয়ে দেখে হাতিটি একটি পাথরের খাদে পা আটকে পড়ে গেছে। শুধু তাই নয়- এদিকটা প্রচণ্ড শ্যাওলা। যেহেতু মানুষের আনাগোনা এদিকে কম। মিনিট পনেরো পর হাতিটি নিজেই আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সবাই কপালে হাত দিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে।

প্রধান হঠাৎ বলে, “সবাই ঝরনার পাশ দিয়ে দিয়ে চল- যতক্ষণ না ভিতরে কোনও আলো দেখছ ভিতরে ঢুকো না- অন্ধকার অচেনা জায়গায় বিপদ হলে কিছু করার থাকবে না।”

প্রধানের কথামত সবাই ঝরনার ধার ধরে চলতে লাগল।

এবার ঝরনাটা অনেক প্রশস্ত। ভিতরটাও হাল্কা সূর্যের আলো ঢুকছে। প্রধানের হুকুমে সবাই ধীরে ধীরে জঙ্গলে ঢোকে। তবে সবাই হাতির পিঠে। মশালের আলোয় চারদিকটা দেখার চেষ্টা করছে সবাই- শুধুই লতাপাতা। হঠাৎ প্রধান উত্তেজিত হয়ে বলে, “এই হারু, সেনাই এখানে যে প্রচুর ভেষজ লতাপাতা রে- ওপারে তো প্রায় সব শেষ। এই যে যতগুলো পারিস- আমি যে যে লতা গুলো বলব- তাড়াতাড়ি কেটে একবস্তা মত সবাই যোগার কর তো।”

সবাই কথামত লতাপাতা যোগার করে নিল। এরপর ধীরে ধীরে আরও ভিতরে হাতিগুলো জঙ্গলে ঢোকে। প্রধান বলে, “এবার রাস্তাটা চেনা পেয়েছি- হ্যাঁ এদিকেই দূরার এসেছিলাম। তবে রাস্তাটা এত পরিষ্কার কে করল? মাটি দেখা যাচ্ছে- এখানে তো বড় বড় গাছ ছিল। হ্যাঁ -ঐ তো -ঐ তো গাছের কাটা গোঁড়াগুলো।”

মহাদেবও শুধু এতক্ষণ দেখে যাচ্ছিল। এবার বলে, “দেখুন, এদিকে না আসলে জানতেও পারতেন না যে চোরা শিকারীরা ওদিক ছেড়ে এদিকেও হানা দিয়েছে। আমাদের যত তাড়াতাড়ি এদিকটা পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।”

প্রধান আপসোস করে বলে, “ঠিক বলেছি।” হাতিরা আরও এগিয়ে যায়, সূর্যের আলো এখন খুব সুন্দর ঢুকছে, তবে জঙ্গলের ভিতরটা পুরো ঠাণ্ডা। আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ আদিবাসীরা হাত ঈশারা করে সবাইকে থামতে বলে।

সবাই তাদের ঈশারাতে দাঁড়িয়ে পরে। প্রধান ওদের ভাষায় কথা বলে জানতে চায় কি হল। পরে প্রধান সবাইকে বলে, “গাছের উপর থেকে কারা যেন আমাদের লক্ষ্য করছে।” তারপরই গুলি একেবারে এক আদিবাসীর উপর। সঙ্গে সঙ্গে বাকি আদিবাসীরাও বিষ মাখা তীর ছুঁড়ে গাছের উপর যারা ছিল তারা সব ধপাধপ নীচে উলটিয়ে পড়ে।

মহাদেব ও প্রধান হাতির উপর থেকেই তাড়াতাড়ি, যার গায়ে গুলি লেগেছিল তার কাঁধে লতাপাতা লাগিয়ে বেঁধে দিল। প্রধান সবাইকে সাবধান করে আর না এগোতে, “আগে এই অসভ্য গুলোকে বাঁধি তারপর এগুলোকে পুলিশের হাতে তুলে দেব।” চারটে লুঠেরাকে বেঁধে, হাতির পিঠে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল। সাথে সাথে বিষ যেন ক্ষতি নাকরে সাথে সাথে প্রধান সেই ওষুধও দিয়ে দেয়। মহাদেব এবার হুমকি দিয়ে বলে, “বাকিটাও চল দেখেনি এদিকে আর কি সব ঘটছে বা ঘটে গেছে।”

তিনটে হাতি এবার একটু তাড়াতাড়ি ভিতর দিকে ঢোকে। এখানে আবার অন্ধকার। মশাল জালিয়ে সবাই দেখতে থাকে এদিক ওদিক।

সেনাই হঠাৎ বলে, “বাবু, দূরে পাথরের কি একটা দেখছি, যাবেন?” মহাদেব বলে, “চল- অবশ্যই- এই সবাই তাড়াতাড়ি এস সবাই যেন অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকবে।” সেনাই ওদের ভাসায় সবাইকে সেটা বলে দেয়। সামনে যেতেই সবার চোখ ছানাবড়া- পাথরের বিশাল লম্বা একটা দেওয়াল- মাঝে মাঝে শিকল দিয়ে বেড়া দেওয়া। আর তাঁর ভিতরে বেশ বড় একটা কটেজ, তাঁর ভিতরে আলো- মানুষের হাঁটাচলা, সব দেখা যাচ্ছে।

মহাদেব বলে, “আর নয় এবার সবাই ফিরে চল, প্রধান আপনি সবাইকে ফিরে যেতে বলুন এদেরকে পুলিশ বাহিনি ছাড়া ধরা যাবে না।” বিকেলের মধ্যেই সবাই ফিরে আসে। মহাদেব সন্ধ্যাবেলা একটা বড় করে চিঠি লেখে ওখানকার আদালতে।

পরদিন কুড়িটা পুলিশের জিপ ও প্রায় দেড়শজন পুলিশের সাহায্যে, ওপারের যত শয়তান গুলো ঘাপটি মেরে বসে ছিল, একে একে সব জেলে ঢোকে। জঙ্গল অনেকটা মুক্ত হয়।

## ১১। মহাদেব বনের রাজা

তারপর প্রায় একমাস, এতদিন মহাদেবের অফিস কামাই, তাও সরকারি চাকরি! উচ্চ আধিকারিকরা খুব ভালো চোখে ব্যাপারটা দেখেনি।

অশনি সংকেত হিসেবে, মহাদেবের সমস্ত কিছু কাজকর্মের হিসেব চাওয়া হল চিঠি মারফৎ। সব থেকে বড় ব্যাপার, হারাধন, সেনাই বাঘের আক্রমণের সেই ভয়ঙ্কর রাতের খবর সব অফিসে জানিয়ে এলেও তাতে কাজ হয়নি। এমনকি হানাদারগুলোকে ধরিয়ে দিয়েও না। বরং উল্টো বিপদ এসে হাজির। তবে সবার পিছনে যে নিতাই আছে সেটা মহাদেব বুঝেছিল। মহাদেব উচ্চ মহল থেকে চিঠি পাওয়া মাত্র নিতাইকে না জানিয়েই, ঘোড়ায় চড়ে সেদিন অফিসে হাজির, এবং সবার আগেই।

দশটায় অফিস, মহাদেব সকাল ছয়টায় হাজির। বৃদ্ধ প্রধানের বোন, ওরফে মহাদেবের আরেক মা, এক গাল হেসে বলে, “তুমি বাঘ, তোমার রক্তে আছে এই আদিবাসীদের টান, তোমার রক্তে মিশে গেছে বাঘের রক্তের তেজ। আর তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। তুমি এমনি আমাদের কাছে দেবদূত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলে, আজ তার সাথে মিশেছে এই শত শত আদিবাসী মানুষের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। যারা তোমার বিরুদ্ধে সড়সড় করেছে, আমি বলে দিচ্ছি- বাবা, কেউ তোমার কেশগ্র স্পর্শ করতে পারবেনা।” এদিকে হারাধন ও সেনাই, মহাদেবের একটু পরেই অফিসে ঘোড়ায় করে হাজির হয়।

সকালে ঘোড়ায় চড়ে ততক্ষণে মহাদেব, হারাধন, সেনাই একসাথে টগবগিয়ে ভীরের বেগে অফিস এর আশপাশটা ভালো করে দেখে নেয়। তারপর চলে যায় ডাক্তারের সাথে দেখা করতে হসপিটালে।

ডাক্তারতো মহাদেবকে দেখে রীতিমত উত্তেজিত। মহাদেব বলে, “আমি কিছুক্ষণ আছি, আপনি আপনার কাজ সেরে ধীরে সুস্থে আসুন, তড়াতাড়ি নেই।” তড়াতাড়ি আবার নেই, ডাক্তার তার রুগীদের বেশ কিছুক্ষণ দেখে আরেকজন ডাক্তারকে দায়িত্ব দিয়ে ছুটে বেড়িয়ে আসে ও সবাইকে নিয়ে চায়ের আড্ডায় বসে। ডাক্তার মহাদেবকে বলে, “আপনি করেছেন কি- গাড়ি ছেড়ে ঘোড়ায় চড়ে এখানে?”

মহাদেব সংক্ষেপে সবটা বলে, ডাক্তারকে আশ্বস্ত করে, “এত সেবা, যত্ন-আমার তো মনে হচ্ছে আমি আবার বছর কুড়িতে ফিরে এসেছি। সত্যি বলছি আমি ভাবিনি এই জঙ্গল মহল আমাকে নতুন জীবন ফিরিয়ে দেবে! আমি তো এখন এই জঙ্গলেরই একজন আদিবাসী।”

মহাদেবের কথা- উত্তেজনা- যেন থামার নয়, শেষে ডাক্তারও বলে, “আমি সব খবরই প্রধানের কাছে পেয়েছি, আজ আপনি যা শুরু করেছেন, নিতাই তার নিজের বাড়িতে দৌড় লাগাবে চিন্তা নেই, কিন্তু বাকি কাজ একটু মাথা খাটিয়ে কিন্তু, আর আমরা সবাই আপনার পাশে আছি, শুধু আগের বারের মত মাথা গরমটা করবেন না দয়া করে।”

মহাদেব যেন হঠাৎ করে চুপ করে গিয়ে বলে, “পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা- এতটাও নিশ্চয় ফেলনা নয়- কি বলেন ডাক্তার বাবু?” ডাক্তার লজ্জা পেয়ে বলে, “আরে ধুর, আমি সেকথা বলিনি, দয়া করে ক্ষমা করবেন যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভুল কিছু বলে বসি”, বলে হাত জোড় করে। মহাদেব এবার হেসে ওঠে, “আরে না না ডাক্তার বাবু, আপনারাই আমার সব, আজ আমি এতগুলো কথা বলছি শুধু আপনাদের আন্তরিক সেবা যন্ত্রের জন্য, আপনারা ছাড়া আমি সত্যি কেউ না।”

বলেই, চা-পর্ব শেষ করে তিন জন ঘোড়সাওয়ারী ঘোড়ায় চড়ে, মহাদেব বলে, “খুব তাড়াতাড়ি আবার আসছি দেখা করতে, যায় এবার ওদিকটা একটু সমাধান করে আসি।”

বলেই তিন অশ্বারোহী ফিরে আসে অফিসের সামনে। সবে নটা ঘড়িতে।

সাড়ে নটা থেকে একে একে সবাই অফিসে ঢুকতে থাকে। ততক্ষণে মহাদেব, হারাধন ও সেনাই তিনজনেই ঘোড়া থেকে নামে। মহাদেব অফিসে ঢুকে যায় ও নিজের জায়গায় আরাম করে বসে।

হারাধন ও সেনাই দুজন ঘোড়াগুলোকে সামলায়। মাঝে মধ্যে অফিসের সামনে ফাঁকা জায়গায় বসে আড্ডা দেয়।

অফিসের সবাই, একে একে স্যারের শরীরের খোঁজ নেয় ও নিজের কাজে বসে যায়। দশটার মধ্যে সবাই চলে আসে, শুধু নিতাই কিছু আড্ডাবাজ বন্ধুদের নিয়ে বেলা বারোটোর সময় সরকারী গাড়িটা নিয়ে অফিসের সামনে এসে দাঁড়ায়।

বেশ হাসি ঠাট্টা চলছিল, হঠাৎ তিনটে ঘোড়া, হারাধন, সেনাইকে দেখে নিতাই ঘাবড়ে যায়, নিজের বন্ধুদের বলে, “এই- এই- তোরা, এখন ভাগ- ভাগ! মনে হচ্ছে বড়বাবু চলে এসেছেন।” শোনা মাত্র নিতাই এর সব বন্ধু হাওয়া। নিতাই অফিসে হস্তদস্ত হয়ে ঢুকতে যায়। কিন্তু দরজায় গেট আগলে দাড়ায় দুজন পুরনো বন্ধুক ধারী দারোয়ান।

নিতাই চিৎকার করে বলে, “এই কি করছিস? গেট আগলাচ্ছিস কেন? ভিতরে যেতে দে।” মহাদেব হার হীম করা ধমক দিয়ে বলে, “খবরদার বেলা বারোটোর সময় কেউ অফিসে ঢুকতে পারে না। আর যে চিৎকার করছে তার সাথে আমি দেখা করতে যাচ্ছি।” সবাই, সব কিছু আগে থেকে আন্দাজ করেছিল, শুধু সময়ের অপেক্ষা করছিল। মহাদেব, গেটের বাইরে এসে নিতাইকে জিজ্ঞেস করে, “কি দরকার?”

নিতাই প্রায় কাঁচুমাচু করে বলে, “স্যার আজ আসলে বাড়িতে একটু দরকার ছিল, তাই দেরি হয়ে গেল।”

মহাদেব বলে, “ঐজন্য অতগুলো বন্ধু নিয়ে আড্ডা মারতে এসেছিলে?” নিতাই বিপদ বুঝে ক্ষমা চায়, “স্যার আর হবে না, দয়া করে ক্ষমা করে দিন।” মহাদেব সোজা বলে দেয়, “এখানে আমার কোনো সরকারী গাড়ির প্রয়োজন নেই প্রথম দিন বলেছিলাম, আজ আবার বলছি। কারণ আমার এই আদিবাসী বন্ধুরা আমাকে ঘোড়া উপহার দিয়েছে, আমি অনায়াসে তাতে যেতে- আসতে পারবো। সেজন্য ভুমিও এখন বাড়ি যাও।”

এরপর মহাদেব আরও দুই মাস মতো অফিস যাতায়াত করে কিন্তু তত দিনে মহাদেব জঙ্গলের স্বার্থে অফিসে পদত্যাগ পত্র জমা দেয়। নতুন অফিসার যে আসে তাঁকে সমস্ত দায়িত্বভার বুঝিয়ে পাকাপাকি মহাদেব জঙ্গলের সেই কটেজে থাকতে লাগে। প্রথম প্রথম নতুন অফিসার ও নিতাই এই জিনিষটা ভালো চোখে দেখেনি। পরে মহাদেব বড় বড় সরকারি আধিকারিকদের দিয়ে বিল পাশ করে জঙ্গলকে পুরোপুরি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবে এতে যে সবটা ভালো হবে না তা মহাদেব জানত। তাই মহাদেব জঙ্গলের প্রধান, ডাক্তার ও নতুন অফিসারের সাহায্যে, জঙ্গলের মধ্যে অবৈতনিক স্কুল, কলেজ তৈরী করে।

নিখরচায় যাতে যে কোনও জঙ্গলবাসীরা চিকিৎসা পরিষেবা পায় তার একটা হাসপাতালও করে দেয় মহাদেব। তবে বাইরের কোনও গাড়ি জঙ্গলে ঢোকা



বারণ হয়ে গেল। নতুন যে ফরেস্ট অফিসার এসেছিলেন তিনিও অফিসেই রাত্রি বাস করতে লাগলেন। মহাদেব অবশ্য সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাই নতুন অফিসারও আর কোনও আপত্তি করেননি, বরং মহাদেব ও ডাক্তার সবার খুব ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছিল।

শুধুমাত্র মহাদেবের অনুমতি নিয়ে জঙ্গলে কেউ ঢুকতে পারত, তাও আবার প্রয়োজনের বাইরে নয়।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বছর পাঁচেক পরের কথা। এই জঙ্গল মহল সম্পর্কে গোটা দেশে কৌতূহলের পারদ বেড়েই চলছে। কিন্তু কোনও উপায়ে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারে না— প্রধানের কড়া নির্দেশ। এমনকি যে পাথুরে মাটির রাস্তা ছিল তাও বড় বড় বৃষ্টিরাজ সব দখল করে বসে আছে। জঙ্গল আরও ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে, তাই সবাই আজ স্বমহিমায়।

এমন সময় একদল অভ্যুত্থানী জঙ্গলপ্রেমী জঙ্গলের সামনে চারটে বড় বড় গাড়ি নিয়ে হাজির। যেমন করে হোক জঙ্গলে তারা ঢুকবেই। কিন্তু জঙ্গলের সামনেই কড়া পাহাড়া। প্রায় সারাদিন পর্যটকরা ছটফট করতে করতে সন্ধ্যার সময় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো।

পাহারাদারদের বেঁধে, কোনো রকমে চারজন, জঙ্গলে ঢোকে। বাকিরা বাইরে রাস্তাতে অপেক্ষা করে। বনের মধ্যে গাড়ী ঢুকতে দেখনি বলে পায়ে হেঁটেই টর্নেলিট নিয়ে এগিয়ে চলল চার অগন্তক। কথায় আছে সাহস ভালো অতি সাহস ভালো না।

এক মিনিট হাঁটার পরেই তিন চার বার গগন বিদারী গর্জনে চারদিকটা কেঁপে উঠল। বাইরে যারা গাড়িতে ছিলে ভয় পেয়ে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে কাঁপতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর জঙ্গল থেকে চারজন পর্যটক পিছমোরা করে বন্দী অবস্থায় রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ায়। পিছনে বিশাল লাঠি হাতে এক সুদর্শন মানুষ, মাথায় ভর্তি চুল, এক মুখ দাড়ি। পরনে ছোট লুঙ্গি আর খালি গা, কপালে লম্বা তিলক।

চারজনকে রাস্তার ধারে এসে তাঁদের মুক্ত করে দেয়। অদ্ভুত দর্শন সেই লোকটি ধমক দিয়ে বলে প্রথমবার বলে প্রাণে বেঁচে গেলে, দ্বিতীয়বার এই স্পর্ধা

দেখালে আমার বন্য সন্তানরা কিন্তু ছেড়ে দেবেনা। পাহারাদারকেও দড়ি খুলে সে মুক্ত করে ও চিঁকার করে হুমকি দেয়।

এত বড় সাহস তোমরা জঙ্গলের পাহারাদার কেউ মাননি। আমি ওদের গুলি করতে বারণ করেছিলাম, তাই কিছু করেনি। না হলে তোমারা কেউ বাঁচতে না।

দেখতে দেখতে দুটি বড় সিংহ সেই অদ্ভুত দর্শন লোকটির পায়ের কাছে এসে বসে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল জঙ্গলের মানুষ তীর, ধনুক, বল্লম নিয়ে গাড়ীর চারপাশটা ঘিরে ফেলে। গাড়ীর ভিতর থেকে কেউ পটাপট কয়েকটা ছবি তুলছিল। একজন জঙ্গলের মানুষ গাড়ীর দরজা ভেঙে তাঁকে ঘাড়ে ধরে বের করে বেদম পেটালো। তারপর ক্যামেরাটা ভেঙে ছুরে ফেলে দেয়।

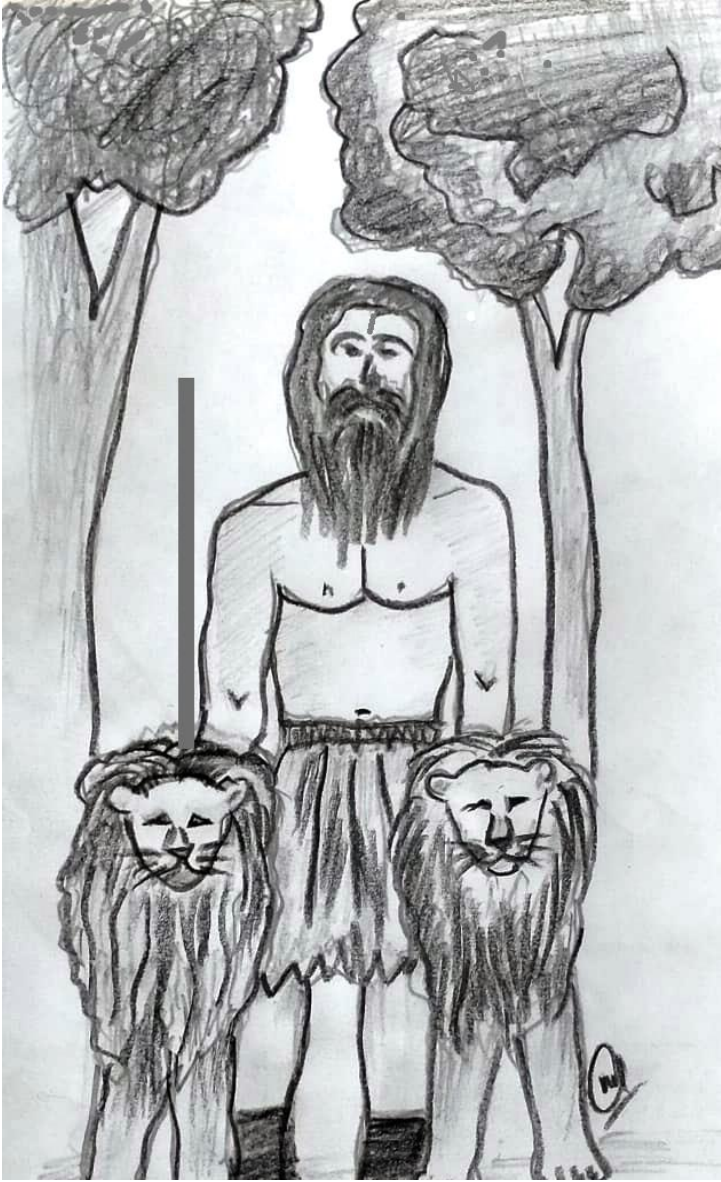
পর্যটকরা সবাই ভয়ে কেঁদে ফেলে। ফোটো তোলার দায়ে সে হাতজোড় করে বলে, “আর আসব না। শুধু একটাই কথা জানার ছিল, আপনিই কি মহাদেববাবু যিনি এই জঙ্গল দেখাশুনা করেন?” উত্তরে সে বলে এখনো প্রাণে বেঁচে আছেন। সময় নষ্ট না করে বাড়ীর দিকে রওনা দিন। আর কোনও প্রশ্ন করবেন না।

এরপর সবাই তাড়াতাড়ি করে গাড়ি নিয়ে একছুটে পালায়।

মহাদেব তার সিংহ শাবক দুটিকে আদর করে বলে, “এইতো বড় হয়েছিস। যেমন চেয়েছিলাম তেমনটি হয়েছিস।” আর দারোয়ান দুজনকে বুক জড়িয়ে বলে, “কোনও ভয় নেই, আমরা সব সময় আছি তোমাদের সাথে। আর সাথে আছে বনদেবতা। দারোয়ান দুজন ছল ছল চোখে মহাদেবকে প্রণাম করে।”

মহাদেব এবার তার সঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে বনের গভীরে হারিয়ে যায়।

সাথে, মিলন হয়, এক আর্থ ও অনার্থ জীবনধারার।



মহাদেব বলের রাজা